প্রকাশক :
শ্রীসুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ :
গৌতম রায়

মুদ্রাকর :
শ্রীশীতলচন্দ্র ঘোষ
শ্রীধরনাথ প্রেস
৮৩বি বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা-৭০০০০৬

দাম : পনেরো টাকা

সুরজিৎ ঘোষ

স্নেহাস্পদেষু

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ :

আকাশের নীচে মানুষ
সুখের পাখী অনেক দূরে
প্রফুল্ল রায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প
আমাকে দেখুন ১/২/৩
সেনাপতি নিরুদ্দেশ
সিন্ধুপারের পাখি
নিজের সঙ্গে দেখা
আমার নাম বকুল
একাকী অরণ্যে
আলোয় ফেরা
রৌদ্রঝলক
পূর্বপার্বতী
স্বর্গের ছবি
শীর্ষবিন্দু
শঙ্খিনী
নয়না

মহাযুদ্ধের ঘোড়া

(২য় পর্ব)

এক

আজ রবিবার। ছুটির দিন হলেও অশোকের মত ফোরমোস্ট ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের ডেইলি রুটিনে ঢিলেঢালা কোন ব্যাপার থাকে না। অন্যদিনের মতই ভোর পাঁচটায় বেয়ারা বেড-টী দিয়ে গেল। বিছানায় কাত হয়ে অনেকটা সময় লাগিয়ে আস্তে আস্তে চা খেল অশোক। এভাবে চা খাওয়াটা তার অনেককালের অভ্যাস।

চায়ের পর ব্যালকনিতে এসে মর্নিং এডিসানের খবরের কাগজগুলো দেখতেই সুন্দরী চীনা যুবতীটি এসে গেল। ম্যাসাজের সময় হয়ে গেছে। এক সেকেণ্ডও দেরি না করে চীনা মেয়েটাকে নিয়ে বাথরুমে ঢুকে পড়ল অশোক। তারপর স্লিপিং গাউন-টাউন খুলে শুধুমাত্র একটা জাঙিয়া পরে ফোমের ম্যাট্রেসের উপর শুয়ে পড়ল।

আগে অচেনা যুবতীদের সামনে এভাবে শুয়ে পড়তে ভয়ানক অস্বস্তি হত। আজকাল তেমন আর কোন ফীলিং হয় না। সমস্ত ব্যাপারটাই এখন মেকানিক্যাল। হ্যাবিট, হ্যাবিট ইজ দ্য সেকেণ্ড নেচার। এখানে আসার পর ম্যাসাজের এই নতুন অভ্যাসটা রপ্ত হয়ে গেছে। এই ইণ্ডাস্ট্রিয়াল হাউস থেকে কোনদিন চলে যেতে হলে এই অভ্যাসটার কী হবে? ভাবতেই একটু হাসি পেল অশোকের।

ম্যাসাজের পর স্নান, স্নানের পর ড্রেস-ট্রেস করে ব্রেকফাস্ট টেবলে যখন অশোক যাবে সেই সময় চন্দ্রকান্ত রাহেজা এলেন। সপ্তাহের অন্য দিনগুলোতে সকাল ছ'টার মধ্যেই রাহেজা গ্রাউণ্ড ফ্লোর থেকে ওপরে উঠে আসেন। কিন্তু রবিবার আসেন দু'ঘণ্টা দেরি করে, আটটা নাগাদ।

চন্দ্রকান্তকে সঙ্গে করে ডাইনিং রুমে চলে এলো অশোক। বেয়ারা বাবুর্চিরা ব্রেকফাস্ট রেডি করেই অপেক্ষা করছিল। অশোকরা বসতেই

সার্ভ করতে শুরু করল। চন্দ্রকান্ত রোজই অশোকের সঙ্গে ব্রেকফাস্ট আর লাঞ্চ খান। ডিনারটাও একসঙ্গে খেতে বলেছিল অশোক। চন্দ্রকান্ত সবিনয়ে জানিয়েছেন, ডিনারটা নিজের ছেলেমেয়ে এবং স্ত্রীর সঙ্গে খেতে চান। অশোক আপত্তি করেনি। খেতে খেতে অশোক জিজ্ঞাসা করল, 'আজ কী প্রোগ্রাম?' সকালে ব্রেকফাস্ট টেবলে বসেই সারা দিনের কাজকর্ম এবং অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথা জেনে নেয় সে।

চন্দ্রকান্ত তাঁর অ্যাটাচি কেস থেকে আগেই প্রকাণ্ড ডায়েরি বার করে ডাইনিং টেবলের একধারে রেখে দিয়েছিলেন। সেটা উল্টে আজকের ডেটের পাতাটা বার করে বললেন, 'ন'টায় মিসেস পারমিতা চ্যাটার্জির সঙ্গে স্লাম দেখতে যাবার কথা আপনার। দুপুরে ওখান থেকে ফিরে লাঞ্চ সেরে হাফ-অ্যান-আওয়ার রেস্টের পর হর্টিকালচার গার্ডেনে ফ্লাওয়ার শো ওপেন করবেন। তারপর যেতে হবে ইস্ট ক্যালকাটা রোটারি ক্লাবে। সেখান থেকে ওয়েস্ট জার্মান কনস্যুলেটে টী-পার্টি। রাত্রে চেম্বার অফ কমার্সের ফর্টনাইটলি ডিনার।'

সকালবেলার প্রোগ্রামটা মনে ছিল অশোকের। পারমিতা চ্যাটার্জি ঠিক ন'টায় এসে তাকে তুলে নিয়ে যাবেন। লীনাকেও ন'টাতেই আসতে বলেছে অশোক। হঠাৎ তার মনে পড়ল, রেখাকে বার বার কথা দিয়েও টালিগঞ্জের সেই ব্যারাক-বাড়িতে যেতে পারেনি। অথচ ওখান থেকে আসার সময় সে বলে এসেছিল, রোজ একবার করে যাবে। কিন্তু প্রতিজ্ঞা পালন একদিনও সম্ভব হয়নি। প্রতিটি দিনের চব্বিশ ঘণ্টা এত প্রোগ্রাম আর অ্যাপয়েন্টমেন্ট, কনফারেন্স, মিটিং, সেমিনার, লাঞ্চ ডিনার টী-পার্টি ইত্যাদি দিয়ে এমনভাবে ঠাসা থাকে যে তার ভেতর থেকে পাঁচটা মিনিটও বার করে নেওয়া যায় না। তিন সপ্তাহ আগেও অশোক যখন পায়ের তলা থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত আগাপাশতলা বেকার তখন সময় আর কাটতে চাইত না। দিনগুলো ছিল অসম্ভব রকমের লম্বা, একঘেয়ে আর বিরক্তিকর। সিনিক, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাশূন্য অশোকের গায়ে প্রতিটি মুহূর্ত তখন যেন ছুঁচ ফোটাতে থাকত। কিন্তু এখন সময় ছুটছে দুর্দান্ত স্পীডে। ঘুম

থেকে উঠবার পরই একটা অদ্ভুত মেকানিক্যাল প্রসেসের মধ্যে সে যেন ঢুকে যায়। সেই প্রসেসটা থেকে মধ্যরাতে যখন অশোক বেরিয়ে এসে নিঃশ্বাস ফেলে তখন শরীরে বা মনে এনার্জির এতটুকু তলানিও পড়ে থাকে না, তখন সে ডগ-টায়ার্ড। ক্লান্ত বিপর্যস্ত উৎসাহশূন্য অশোক কোন রকমে এক ফুট পুরু ফোমের বিছানায় নিজেকে ছুঁড়ে দিয়ে পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে ঘুমের আরকে ডুবে যায়। রাতটা কাটলে পরের দিন আবার সেই একই রকম ঠাসা প্রোগ্রাম, একই রকম ব্যস্ততা। একটা দিন আরেকটা দিনের হুবহু কার্বন-কপি। প্রত্যেকটা দিন যদি চব্বিশ ঘণ্টার জায়গায় বাহাত্তর ঘণ্টা হত। তা হলেও দম ফেলার একটু সময় পাওয়া যেত কিনা সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে অশোকের।

যাই হোক, টালিগঞ্জের ব্যারাক-বাড়ির সবাইকে—বিশেষ করে রেখাকে বোঝানো যাবে না, প্রতিজ্ঞাভঙ্গটা ইচ্ছাকৃত নয়। রেখা এর মধ্যেই যথেষ্ট ভুল বুঝতে শুরু করেছে। সেটাই অবশ্য স্বাভাবিক।

অশোক ঠিক করে ফেলল, আজ পারমিতা চ্যাটার্জির সঙ্গে বস্তিতে গিয়ে তাঁর সোস্যাল আর ওয়েলফেয়ার অ্যাকটিভিটি দেখে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সোজা টালিগঞ্জের ব্যারাক-বাড়িতে চলে যাবে। অনেক দিন মালতী কাকিমার হাতের রান্না খাওয়া হয়নি। তা ছাড়া আজ ছুটির দিন, হরকাকাকেও বাড়িতে পাওয়া যাবে। রেখাকে ডেকে এনে সবাই মিলে দুপুরবেলা হৈ হৈ করে তারা খাবে। ভুল বোঝাবুঝি যেটুকু হয়েছে, নিশ্চয়ই তাতে কেটে যাবে। যে ভাবেই হোক রেখার মনে যে ছায়াটুকু পড়েছে তা মুছে ফেলা দরকার।

অশোক ভাবল, চন্দ্রকান্ত রাহেজাকে সঙ্গে নেবে না। একেবারে ঝাড়া হাত-পায়ে, ফ্রী মুডে, ঘাড়ের ওপর গুচ্ছের প্রোগ্রামের চাপ না রেখে টালিগঞ্জের ব্যারাক-বাড়িতে যাবে। মুখ তুলে অশোক বলল, 'মিস্টার রাহেজা—'

চন্দ্রকান্ত চামচ দিয়ে দুধের সঙ্গে কর্ণফ্লেক মেশাচ্ছিলেন। কিছু না বলে অশোকের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

অশোক বলল, 'দুপুর পর্যন্ত তেমন কোন ইমপর্ট্যাণ্ট কাজ নেই। আপনাকে আর কষ্ট করে আমার সঙ্গে প্লাসে যেতে হবে না। এ বেলাটা আপনি রেস্ট নিন।'

চন্দ্রকান্ত বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। আপনার হয়তো অসুবিধা হবে।'

'না—না, কিচ্ছু অসুবিধা হবে না।'

'আপনার লাঞ্চ?'

'সে একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আপনি চিন্তা করবেন না।'

'তিনটের পর থেকে অনেকগুলো প্রোগ্রাম আছে কিন্তু স্যার।'

'আমার মনে আছে।'

'আপনার সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ করব?'

'তিনটের আগেই আমি ফিরে আসব।'

ব্রেকফাস্ট চুকিয়ে লিফটে করে নীচে নেমে এলো অশোক, সঙ্গে চন্দ্রকান্ত। সোজা সামনের লনে গিয়ে গার্ডেন আমব্রেলার নীচে বেতের সোফায় বসল সে।

ন'টা বাজতে এখনও মিনিট কয়েক বাকী। এখনই পারমিতা আর লীনা এসে পড়বে। অবশ্য একসঙ্গে না, আলাদা আলাদা। ওপর থেকে তো নামতেই হবে। আগেই এসে অশোক অপেক্ষা করতে লাগল।

ঠিক ন'টায় লীনা একটা স্পোর্টস কারে করে চলে এলো। গাড়িটা লনের পাশের রাস্তায় পার্ক করে অশোকের কাছে আসতে আসতে হাত নাড়ল, 'হাই—'

অশোকও হাত নাড়ল, একটু হাসল, তবে কিছু বলল না।

লীনা লনের ভেতর সবে পা দিয়েছে, সেই সময় অনেক পুরনো মডেলের একটা রঙচটা ছোট্ট হিলম্যান গাড়িতে করে কম্পাউণ্ডের ভেতর ঢুকলেন পারমিতা চ্যাটার্জি। নিজে অবশ্য চালিয়ে আসেন নি, সঙ্গে ড্রাইভার এসেছে। তিনি আর শোফার ছাড়া গাড়িতে আর কেউ নেই।

পারমিতার পরনে মাঝারি দামের সাদা খোলের লালপাড় তাঁতের শাড়ি আর সাদা ব্লাউজ। বাঁ হাতে স্টীল ব্যাণ্ডের চৌকো বড় একটা রিস্টওয়াচ ছাড়া গোটা শরীরে কোন গয়না-টয়না নেই। পায়ে দুই স্ট্র্যাপের স্লিপার। কপালে গোলাকার সিঁদুরের টিপ। আজকাল ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের স্ত্রীরা সিঁদুর-ফিঁদুর পরে না। পারমিতা কিন্তু পুরনো ট্র্যাডিসান চালু রেখেছেন। যাই হোক এই সামান্য পোশাকেই তাঁকে অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত বা ডিগনিফায়েড দেখাচ্ছে।

ইণ্ডিয়ার একজন টপমোস্ট ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের স্ত্রী এ রকম লঝঝড় গাড়িতে, এ রকম সাধারণ মধ্যবিত্ত ক্লাসের পোশাকে বাড়ির বাইরে বেরোন, ভাবাই যায় না।

অশোক পারমিতাকে দেখেই উঠে পড়েছিল। সেই সঙ্গে চন্দ্রকান্তও। লীনাও দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। অশোক ব্যস্তভাবে হিলম্যান গাড়িটার কাছে চলে এলো। দেখাদেখি লীনা আর চন্দ্রকান্তও পেছন পেছন ছুটলেন।

অশোক বলল, 'আসুন—আসুন মিসেস চ্যাটার্জি।'

পারমিতা বললেন, 'এখন আর নামব না। সাড়ে ন'টার মধ্যে আমাদের বেলেঘাটার স্লামে পৌঁছুতে হবে। আরো অনেকে সেখানে অপেক্ষা করছেন।'

'প্রথম দিন এলেন, একটু চা খেয়ে গেলে আমার খুব ভাল লাগত।' বলেই ভেতরে ভেতরে খানিকটা কুঁকড়ে গেল অশোক। দেশের ফোরমোস্ট শিল্পপতির স্ত্রী বলেই কি পারমিতা চ্যাটার্জিকে সে সূক্ষ্মভাবে খুশি করতে চাইছে? বড়লোক সম্পর্কে গরীবদের সেই পুরনো কমপ্লেক্স! পরক্ষণে অশোক নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করল, এর মধ্যে কমপ্লেক্সের কী থাকতে পারে? কেউ বাড়ি এলে তাকে চা খেতে বলাটা সাধারণ ভদ্রতা।

পারমিতা সোনার ফুলদানির মত নিটোল ঘাড় বাঁকিয়ে হাসলেন। বললেন, 'প্লিজ মিস্টার ব্যানার্জি, আজ না। আরেক দিন এসে চা খাব।'

কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘাড় কাত করলে এবং ক'টা দাঁতের কতটুকু

অংশ বার করে হাসলে তাঁকে বিশেষভাবে আকর্ষণীয় দেখায়, পারমিতা খুব সম্ভব সে সম্পর্কে রীতিমত সচেতন। চায়ের ব্যাপারে আর জোরজার বা অনুরোধ করল না অশোক।

পিছন থেকে লীনা সামনের দিকে এগিয়ে এসেছিল। সে বলল, 'আন্টি আমিও কিন্তু আপনার স্লাম দেখতে যাচ্ছি।'

পারমিতা বললেন, 'সিওর। মোস্ট ওয়েলকাম।'

'থ্যাঙ্ক ইউ আন্টি।' বলে একটু চুপ করল লীনা। পরক্ষণে আবার শুরু করল, 'ক'দিন আগে অশোক বলছিল আজ আপনার সঙ্গেও স্লাম দেখতে যাবে। ওকে ধরেছিলাম আমাকেও নিয়ে যাবার জন্য। সকালে ঘুম থেকে উঠেই আজ এখানে চলে এসেছি।'

পারমিতা মধুর হাসলেন, 'কতক্ষণ এসেছ?'

'দু'মিনিটও হয়নি। তার মধ্যেই আপনি এসে পড়লেন।'

'ভালই হয়েছে। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় নি।'

এরপর ঠিক হল, অশোক তার গাড়িতে লীনাকে নিয়ে বেলেঘাটায় যাবে। পারমিতা হিলম্যানেই যাবেন। তাঁর গাড়িটা সামনে থেকে অশোকদের রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে যাবে। লীনার স্পোর্টস কারটা আপাতত এখানেই থাকবে। পরে এক সময় সে এসে ওটা নিয়ে যাবে।

চন্দ্রকান্ত শোফারকে ডেকে অশোক আর লীনার জন্য গাড়ি বার করতে বললেন। ঝকঝকে ইউনিফর্ম-পরা দারুণ স্মার্ট একটা ছোকরা কমপাউণ্ডের পিছন দিকের শেডের তলা থেকে একটা ইমপোর্টেড লিমুজিন নিয়ে এসে ড্রাইভে রাখল।

এ রকম একটা গাড়িতে করে বস্তিতে যেতে ভীষণ খারাপ লাগছিল অশোকের। কিন্তু উপায় নেই। তার চলাফেরার জন্য এখানে যত গাড়ি মজুত রয়েছে তার কোনটাই দিশী না, জাপান, জার্মানি, বৃটেন, আমেরিকা এবং ফ্রান্সের ওয়ার্ল্ড ফেমাস ক'টা কোম্পানির লেবেল গাড়িগুলোর গায়ে লাগানো রয়েছে। এই সব লিমুজিনের কোনটারই দাম দু-আড়াই লাখের নীচে হবে না।

শোফার দরজা খুলে দিয়েছিল। লীনা আগে উঠে পড়ল। তার

পর অন্যমনস্কের মত উঠল অশোক।

এক সময় লনের পাশের ড্রাইভ থেকে ওরা বাইরের রাস্তায় বেরিয়ে এলো। আগে আগে পারমিতার রঙচটা পুরনো মডেলের ছোট্ট হিলম্যান যাচ্ছে। তার পেছনে অশোকের লিমুজিন। দু'লাখ টাকার গাড়িতে করে বস্তি দেখতে যাচ্ছে, ভাবতেই কেমন যেন নার্ভাস হয়ে পড়তে লাগল সে। নিজের ভেতর এক ধরনের পাপবোধ ঘুণপোকার মত বুকের শিরা কাটতে লাগল। বার বার তার মনে হতে লাগল, এটা ঠিক হচ্ছে না, এটা ঠিক হচ্ছে না।

আরো একটা ব্যাপার মনে হচ্ছে অশোকের। আজ দেশের একজন টপ ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের ভূমিকায় অভিনয় করে গেলে কী হবে, আসলে সে একজন বস্তিবাসী ভবিষ্যৎহীন সিনিক যুবক। সে কিনা স্লাম দেখতে যাচ্ছে দামী ইমপোর্টেড লিমুজিনে চেপে আর কান্টির একজন আসল ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের স্ত্রী যাচ্ছেন থার্ড ক্লাস পুরনো মডেলের খেলো গাড়িতে করে। জীবনে এজাতীয় উদ্ভট ঘটনা কখনও ঘটবে, আগে কোনদিন কি ভাবতে পেরেছে অশোক।

পাশ থেকে লীনা হঠাৎ ডেকে উঠল, 'অশোক—'

অন্যমনস্ক অশোক চমকে ঘাড় ফেরাল, কিছু বলবে?'

লীনা আদুরে ন্যাকা মেয়েদের মত দু'হাত ঘষতে ঘষতে বলল, 'দারুণ থ্রিল লাগছে। সেই সঙ্গে আই ফীল ট্রিমেণ্ডাসলি একসাইটেড।'

বুঝতে না পেরে অশোক জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

'স্লাম দেখতে যাচ্ছি যে—'

মেজাজ খারাপ হয়ে গেল অশোকের। লীনার ভাবভঙ্গি দেখে এবং কথা বলার ধরন লক্ষ্য করে মনে হচ্ছে, এই নেকী ছুঁড়িটা যেন ওয়ার্ল্ডের সেভেন্‌থ্‌ ওয়াণ্ডার অর্থাৎ সপ্তম আশ্চর্যের একটা দেখতে যাচ্ছে। ঈষৎ রুক্ষ গলায় অশোক বলল, 'আগে কখনও বস্তি-ফস্তি দেখ নি?'

লীনা বলল, 'দেখব না কেন? দিস ক্যালকাটা ইজ এ সিটি অফ স্লামস। যেদিকে তাকাবে সেদিকেই তো বস্তি।'

'তা হলে এত থ্রিল আর একসাইটমেণ্ট কেন ?'

'এই প্রথম স্লামের ভেতর ঢুকতে যাচ্ছি।'

'এত দিন তবে বাইরে থেকে দেখেছ ?'

'রাইট।'

'তোমার জন্ম কোথায় ?'

'এই ক্যালকাটায়।'

'ক্যালকাটায় জন্মেও কোন বস্তিতে ঢোকো নি ?'

'সুযোগ পাই নি। আই মীন কেউ আমকে নিয়ে যায় নি।'

গলার স্বরে খানিকটা বিদ্রূপ মিশিয়ে অশোক বলল, 'তুমি না ইণ্ডিয়ার মত আণ্ডার-ডেভলাপড দেশের সোসালি আর ইকনমিক্যালি ব্যাকওয়ার্ড মানুষদের অবস্থা নিয়ে থীসিস লিখে আমেরিকায় ডক্টরেট হয়েছ ?'

লীনা বলল, 'হ্যাঁ।'

'অথচ যাদের ওপর তোমার এত বড় রীসার্চ তাদের অবস্থা নিজের চোখেই দেখনি! ফাইন!' বলে ঠোঁট এবং চোখ কুঁচকে হাসল অশোক।

লীনা খনিকটা থতিয়ে গেল, 'না, মানে ডিফারেণ্ট সোর্স থেকে কারেক্ট ডাটা আর স্ট্যাটিসটিক্স যোগাড় করে থীসিসটা তৈরি করেছি। স্লাম ঘোরা সম্ভব হয়নি, কারণ তখন আমি আমেরিকায়। তবে একটা ব্যাপার তোমাকে জোর দিয়ে বলতে পারি—আমার মধ্যে কোন রকম ফাঁকি ছিল না। মাই পারপাস ওয়াজ রিয়ালি সিনসিয়ার অ্যাণ্ড জেনুইন। পভার্টি লাইনের নীচেকার ভাস্ট হিউম্যানিটি সম্পর্কে আমার প্রচুর সিমপ্যাথি। আই ফীল ফর দেম।'

অশোক উত্তর দিল না।

লীনা আবার বলল, 'এই সব মানুষের দুঃখকষ্ট আর সাফারিং-এর কথা আমার রীসার্চ ওয়ার্কের মধ্যে পরিষ্কার করে লিখেছি। দু'মাস বাদে জেনেভাতে ওয়ার্ল্ডের বস্তিবাসীদের সম্পর্কে যে কনফারেন্স হচ্ছে, যদি সেখানে ডেলিগেট হবার সুযোগ পাই—ডিটেলে এদের কথা বলব। সীরিয়াসলি বলছি, এই ডেস্টিটিউটদের ব্যাপারে আমি

সিনসিয়ার ফাইটার। হোল লাইফ এদের জন্য লড়াই করে যাব। পৃথিবী থেকে এই পভার্টির মত সোসাল ইভিল দূর করতেই হবে।’

আরব্যান স্লাম-ডোয়েলার অর্থাৎ শহুরে বস্তিবাসী ছাড়াও দারিদ্র্য-সীমার নীচেকার কোটি কোটি মানুষের হয়ে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে স্যার হরকিষণ দাস দেশাইয়ের মত অ্যালকোহলিক মেয়ে লীনা দেশাই কখন কী ভাবে যুদ্ধ করল, অশোক সবটা জানে না। যতদূর জানে, কাজের মধ্যে আমেরিকান পারমিসিভ সোসাইটিতে সে উড়ে বেড়িয়েছে, উইক-এণ্ডে একেক দেশের ছোকরা জুটিয়ে ডেটিং করেছে আর অজস্র লিটার হুইস্কি রাম বা জিন খেয়েছে। কয়েক কেজি এল-এস-ডি আর ম্যানড্রেক্সও তার পাকস্থলীতে জমা হয়েছে। ফ্রী সেক্স, ফ্রী সোসাইটি, অ্যালকোহল, ম্যানড্রেক্স, ডেটিং—ইত্যাদির ফাঁকে ফাঁকে এর ওর বই থেকে স্ট্যাটিসটিক্স্ টুকে টুকে দারিদ্র্যসীমার নীচের মানুষজন সম্পর্কে রীসার্চের নামে কী বস্তু খাড়া করেছে, লীনাই জানে। অশোক তা চোখেও ছাখেনি, সেই চোতা কাগজ ক'টা দেখার বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও নেই তার।

পভার্টি লাইনের নীচের যে মানুষজন সম্পর্কে যে লড়াইয়ের কথা এই মুহূর্তে লীনা ঘোষণা করল তার আসল উদ্দেশ্যটাও অশোকের কাছে জলের মত স্পষ্ট। জেনেভায় বস্তিবাসীদের জীবনযাত্রা, পরিবেশ এবং অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে যে কনফারেন্স হবার কথা, সেখানে যেমন করে হোক, ইণ্ডিয়ান ডেলিগেসনে সে ঢুকতে চায়। ডেলিগেট সে হবেই, কারো ক্ষমতা নেই তাকে আটকাতে পারে।

যাই হোক, অশোক এবারেও কিছু বলল না। সমস্ত ব্যাপারটাই যখন তার কাছে পরিষ্কার তখন বলার কীই-বা থাকতে পারে।

দুই

কিছুক্ষণের মধ্যে বেলেঘাটার শেষ মাথায় একটা ঘিঞ্জি বস্তির সামনে এসে হিলম্যান গাড়িটা থামালেন পারমিতা। দেখাদেখি অশোকদের লিমুজিনটাও থামল।

গাড়ি থামতেই পারমিতা নেমে পড়লেন। অশোক আর নীলাও নামল। নামার সঙ্গে সঙ্গে অশোকের চোখে পড়ল, আরো দশ-বারোটা প্রাইভেট কার, স্টেশন ওয়াগন আর ভ্যান এধারে ওধারে দাঁড়িয়ে আছে। গাড়িগুলোর বেশির ভাগই বিদেশী। কয়েকটাতে আমেরিকান এবং অন্যান্য কনস্যুলেট কোরের নাম্বার প্লেট লাগানো রয়েছে। দুটো স্টেশন ওয়াগন আর একটা ভ্যানের গায়ে লস এঞ্জেলসের একটা প্রাইভেট টি-ভি কোম্পানির নাম দেখা যাচ্ছে।

আমেরিকান টি-ভি কোম্পানি, কনস্যুলেটের গাড়ি—ইস্টার্ন ক্যালকাটার এই বস্তিতে এ সবের কী দরকার, বুঝতে পারছিল না অশোক।

পারমিতা ক'পা এগিয়ে এসে বললেন, 'আসুন মিস্টার ব্যানার্জি, এসো লীনা—'

বস্তিটা এখান থেকে শ'খানেক গজ দূরে। সেখানে প্রচুর লোকজন দাঁড়িয়ে আছে। চেহারা এবং পোশাক দেখে আন্দাজ করা যায়, তাদের বেশির ভাগই বস্তিবাসী। এরা ছাড়া স্মার্ট চেহারার আট-দশটি যুবককেও দেখা যাচ্ছে। বোঝা যায়, বস্তির মানুষজনের সঙ্গে মিশে থাকলেও তারা স্লাম-ডোয়েলার নয়। পারমিতাকে দেখে ওরা সবাই হুড়মুড় করে দৌড়ে এলো এবং সসম্ভ্রমে খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে সঙ্গে সঙ্গে বস্তির দিকে চলতে লাগল। বোঝা যায় রাস্তা থেকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাবার জন্য ওরা বস্তির মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

পারমিতা চারপাশের লোকজনের দিকে তাকিয়ে মধুর একটু হাসলেন। তারপর একটি যুবককে ডাকলেন, 'প্রবীর—'

ভিড়ের ভেতর থেকে প্রায় ঊর্ধ্বশ্বাসে চব্বিশ পঁচিশ বছরের পাতলা ধারালো চেহারার একটি যুবক কাছে এসে দাঁড়াল। মুখচোখ দেখে মনে হল পারমিতা তাকে ডাকতে হাতের ভেতর স্বর্গ পেয়েছে। প্রায় দম বন্ধ করে পারমিতার দিকে তাকিয়ে সে পা ফেলতে লাগল।

পারমিতা এবার বললেন, 'টি-ভি আর কনস্যুলেটের লোকেরা এসে গেছেন দেখছি।'

প্রবীর বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ ম্যাডাম।'

'কোন্ কোন্ কনস্যুলেটের লোক এসেছেন?'

'ওয়েস্ট জার্মান, আমেরিকান আর ফ্রেঞ্চ কনস্যুলেটের।'

'জার্মান জার্নালিস্ট মিস্টার গাণ্টারম্যান-এর আসার কথা ছিল। এসেছেন?'

'এসেছেন।'

টি-ভি, নিউজ পেপার, কনস্যুলার কোর—দেখা যাচ্ছে সব দিক থেকেই দুর্দান্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পারমিতা এবার জিজ্ঞেস করলেন, 'ওঁরা কোথায়?'

প্রবীর বলল, 'স্কুলে বসিয়েছি।'

পারমিতা আর প্রশ্ন করলেন না।

বস্তির কাছে আসতেই ঢোকার মুখে লাল শালুর একটা তোরণ দেখা গেল।

তোরণটার মাথায় সাদা অক্ষরে লেখা আছে 'স্বাগতম'।

তোরণের পর বস্তিটা যেখান থেকে শুরু হয়েছে সেখানে একটা সুদৃশ্য টিনের সাইন বোর্ডে তিনটে ভাগ করে ইংরেজি, বাঙলা এবং হিন্দীতে লেখা আছে:

নবজীবন প্রকল্প

মহাপরিচালিকা: পারমিতা চট্টোপাধ্যায়

বেলেঘাটা: কলিকাতা

তোরণের নীচ দিয়ে ছুঁচের পেছনে সুতোর মত পারমিতা চ্যাটার্জির পেছন পেছন অশোকরা বস্তির ভেতর ঢুকে পড়ল। এখান থেকেই টালি এবং খাপরার চালের নিশ্চল ঢেউ চারদিকে ছড়িয়ে গেছে। নীচে জিলিপির প্যাঁচের মত সরু সরু গলি। গলিগুলোর দু'ধারে ঘরের পর ঘর। ঘর বললে সেগুলোকে যথেষ্টই মর্যাদা দেওয়া হয়। খাপরা বা টালির চালের নীচে পীচবোর্ড, পেটা টিন কিংবা প্যাকিং বাক্সের কাঠের দেওয়াল। ঘরগুলোর সামনের দিকে এক চিলতে করে বারান্দা। জানালা বলতে তিন ফুট বাই দু'ফুটের দুটো করে ফোকর আর দরজা বলতে নীচু মত একটা করে সুড়ঙ্গ। দেখামাত্রই টের পাওয়া যায়, একেকটা ঘরে একেকটা ফ্যামিলি থাকে।

একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা যাচ্ছিল, যে রাস্তাটা ধরে অশোকরা যাচ্ছে সেটা যেন সবেমাত্র ঝাঁট-টাট দিয়ে পরিষ্কার করে ডি-ডি-টি বা ঐ জাতীয় কোন ডিসইনফেকটান্ট ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। দু'ধারের ঘরগুলোও যতটা পারা যায় সাফ-টাফ করে ঝকঝকে করে তোলা হয়েছে। কনস্যুলার কোর, ফরেন জার্নালিস্ট আর আমেরিকান টি-ভির রিপ্রেজেন্ট্যাটিভদের মত ভি-আই-পীরা আসছেন বলেই কি এই সব ব্যবস্থা ?

আরো একটা ব্যাপার চোখে পড়ছিল। এখানে শুধু মানুষ আর মানুষ। ম্যাল-নিউট্রিসানে ভোগা ক্ষয়াটে চেহারার সব নারী-পুরুষ। তবে বয়স্ক মানুষের দশগুণ হল বাচ্চাকাচ্চা। মা-বাপের শারীরিক ক্ষয় নিজেদের মধ্যে নিয়ে তারা জীবাণুর মত বস্তি জুড়ে কিলবিল করছে।

পপুলেসন এক্সপ্লোসানের বাংলা কী ? জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ? মানে যা-ই হোক, এই মুহূর্তে অশোকের মনে হল, বেলেঘাটার এই বস্তিটায় না এলে এই বিস্ফোরণ তার চোখে পড়ত না। সে নিজেও টালিগঞ্জের এক ব্যারাক-বাড়িতে থাকে। মানে থাকত। সেটাও একটা বস্তি। সেখানেও একেক ঘরে একেকটা ফ্যামিলি। কিন্তু সেই ব্যারাক-বাড়ি বেলেঘাটার এই বস্তির তুলনায় স্বর্গ।

অপুষ্টি আর অর্ধাহারের শিকার চারপাশের ক্ষয়াটে রুগ্ন চেহারার

এই সব মানুষজন দেখতে দেখতে অশোকের নার্ভগুলোর ভেতর দিয়ে ঠাণ্ডা স্রোতের মত কিছু বয়ে গেল। পভার্টি লাইনের নীচেকার হাজার হাজার মানুষকে পশুর জীবন থেকে মানুষের স্তরে টেনে তুলে আনার জন্য সে দারুণ এক চ্যালেঞ্জ নিয়েছে। আজ কত দিন হয়ে গেল সে দেশের একজন ফোরমোস্ট ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হয়েছে। কিন্তু একটা ফ্যামিলি দূরের কথা, একটা মানুষকেও কি দারিদ্র্যসীমার নীচে থেকে তুলে আনতে পেরেছে সে? অশোক খুব নাভার্স হয়ে পড়তে লাগল।

হঠাৎ পাশ থেকে চাপা নীচু গলায় ফিসফিসিয়ে উঠল লীনা, 'হরিবল্—'

চমকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল অশোক। লীনা নাকে দামী ফরেন সেণ্ট মাখানো রুমাল চেপে ধরে বস্তির আবহাওয়া থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য শরীরটাকে কুঁকড়ে পা টিপে টিপে হাঁটছে। অশোক জিজ্ঞেস করল, 'কী হরিবল্?'

'এখানকার সব কিছু। দিস ফিল্‌দি অ্যাটমসফীয়ার—এখানে হাওয়ায় ওয়ার্ল্ডের সব রকম রোগের ব্যাকটেরিয়া রয়েছে।' লীনা বলল।

অশোক উত্তর দিল না।

লীনা থামেনি, 'আর মানুষগুলো। যেন রেলিক্স অফ হিউম্যানিটি। সব একেবারে সাব-হিউম্যান স্টেজে পড়ে আছে।'

অশোক এবারও কিছু বলল না।

লীনা বলতে লাগল, 'মানুষ যে এ রকম একটা হেলিশ অ্যাটমসফীয়ারে বেঁচে থাকতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস হত না।'

এতক্ষণে মুখ খুলল অশোক। বলল, 'অথচ দেখ, এদের ক্যাপিটাল করেই তুমি কেমন একটা থীসিস বানিয়ে ফেলেছ। কিন্তু যাদের নিয়ে তোমার অত বড় রীসার্চ, তাদের লাইফে এই প্রথম দেখলে।'

অশোকের কথায় তীক্ষ্ণ একটা খোঁচা ছিল। লীনা কিছুটা হকচকিয়ে গেল। তারপর অল্প হেসে বলল, 'প্লীজ, আমাকে লজ্জা দিও না। এই কথাটা অনেক বার বলেছ। আমি নিজেও কনফেস

করেছি, স্লাম আর স্লাম ডোয়েলারদের সম্পর্কে আমার পার্সোনাল কোন রকম এক্সপীরিয়েন্সই নেই। ওদের দেখবার জন্যই তো আজ তোমার সঙ্গে এলাম।'

অশোক বলল, 'তুমি যখন এমব্যারাসড্ হচ্ছ তখন আর বলব না। এখানে এসেছ, ভাল করে সব দেখ। একটা কথা মনে রেখো, হীয়ার লাইজ এ পার্ট অফ রীয়াল ইণ্ডিয়া।'

লীনা তক্ষুণি ঘাড় হেলিয়ে দিল, 'একশোবার আমি তা স্বীকার করছি।'

কথায় কথায় ওরা বেশ ফাঁকা মত একটা জায়গায় এসে পড়ল। প্রায় পাঁচ-ছ'শো স্কোয়ার মিটারের মত চৌকো এরীয়া। এর চারপাশ ঘিরে চাপ-বাঁধা বস্তি।

ফাঁকা জায়গাটা এই বিশাল স্লাম এরীয়ার ফুসফুস যেন। এখানে চমৎকার একটা পার্ক রয়েছে। পার্কে দোলনা, নানা রকম পাখির জন্য তারে ঘেরা শেড, নকল পাহাড়, সিমেন্টে তৈরি রেলগাড়ি এবং বাচ্চাদের খেলাধুলোর অনেক রকম ব্যবস্থা। মাঠটার একদিকে ঝকঝকে দোতলা দুটো বাড়ি। একটা বাড়ির গায়ে সাইনবোর্ডে লেখা আছে 'নবজীবন প্রাইমারি স্কুল'। তার পরের বাড়িটার মাথায় লেখা 'নবজীবন হেল্‌থ সেণ্টার'। হেল্‌থ সেণ্টারের বিরাট লম্বা তিন চারটে শেড। সাইনবোর্ড দেখে বোঝা যায় ওগুলো প্রোডাকসান-কাম-ট্রেনিং সেণ্টার। এই সেণ্টারগুলোও নবজীবন প্রকল্পেরই একেকটা উদ্যোগ। নোংরা ঘিঞ্জি সাব-হিউম্যান স্টেজের প্রাণীর বাসস্থানের মত এই বস্তি এলাকায় ঝকঝকে স্কুলবাড়ি, হেল্‌থ সেণ্টার, সবুজ কার্পেটের মত পার্ক আর ট্রেনিং সেণ্টার—সব কিছু যেন চমকে দেবার মত ব্যাপার।

পারমিতা সামনের দিকেই ছিলেন। চলতে চলতে ঘাড় ফিরিয়ে অশোকদের বললেন, 'আসুন। আগে ঐ স্কুল বিল্ডিং-এ যাব।'

অশোক কিছু বলল না। পার্কের পাশের কংক্রীটের রাস্তা দিয়ে পারমিতার দশ ফুট পিছনে থেকে এগিয়ে যেতে লাগল।

পাশ থেকে লীনা নীচু গলায় বলল, 'ইউনিক। পারমিতা আন্টি দুর্দান্ত কাজ করেছেন। একসেলেণ্ট সারভিস টু হিউম্যানিটি।'

অশোক উত্তর দিল না।

একটু পর সবাই স্কুল বিল্ডিংয়ের কাছে চলে এলো।

স্কুলের সামনে এখন দারুণ ভিড়। গোটা বস্তি এলাকার সব মানুষ ওখানে জড়ো হয়েছে এবং ভেতর দিকে গলা বাড়িয়ে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে।

পারমিতাকে দেখে সবাই সসম্ভ্রমে সরে সরে রাস্তা করে দিল। মুখ-চোখে স্নিগ্ধ হাসির সর মাখিয়ে মানুষের ঘন ভিড়টার দিকে তাকাতে তাকাতে দারুণ নরম গলায় পারমিতা বলতে লাগলেন, 'কেমন আছ অধর?' কিংবা 'মধু, তোমার ছেলেকে ঠিকমত স্কুলে পাঠাচ্ছ তো?' বা 'তোমার স্ত্রীর এক্স-রে করিয়ে নিয়েছ তো রজনী?'

অশোক অবাক হচ্ছিল এই ভেবে, এখানকার বিশাল স্লাম এরীয়ার সব মানুষের নামও তিনি জানেন নাকি? বেলেঘাটার এই বস্তীতে কত লোক থাকে? কম করে দশ বারো হাজার। এত লোকের নাম এবং তাদের পারিবারিক ব্যাপার মনে রাখা কি সম্ভব? পারমিতাকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখতে হবে।

একটু পর স্কুল বাড়ির দোতলার বড় একটা হলঘরে পারমিতার সঙ্গে অশোক এবং লীনা পৌঁছে গেল।

এখানে কয়েকজন ইওরোপীয়ান আর আমেরিকান অপেক্ষা করছিলেন। তাঁদের দেখাশোনার জন্য সাত-আটটি ঝকঝকে চেহারার যুবক মজুদ রয়েছে। ওরা পারমিতা চ্যাটার্জির নবজীবন প্রকল্পের কর্মী।

বিদেশীদের দেখামাত্র অশোক বুঝতে পারল, ওঁরা সেই টি-ভি আর কনস্যুলেট কোরের লোকজন। পারমিতা হলঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সবাই উঠে দাঁড়ালেন।

ভারতীয় পদ্ধতিতে হাতজোড় করে সুচারু ভঙ্গিতে মধুর একটু হাসলেন পারমিতা। তারপর নিখুঁত বৃটিশ উচ্চারণে পরিচ্ছন্ন ইংরেজিতে সবার শরীর-স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোঁজখবর নিলেন। কতক্ষণ তাঁরা এই স্কুল বাড়িতে এসে অপেক্ষা করছেন, জিজ্ঞেস করলেন।

ওঁরা জানালেন, মিনিট কুড়ির মত অপেক্ষা করছেন।

এতটা সময় বসিয়ে রাখার জন্য প্রত্যেকের কাছে আলাদা আলাদা ভাবে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে হঠাৎ লক্ষ্য করলেন, সবাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। দারুণ ব্যস্তভাবে ওঁদের বসতে বলে নিজেও বসলেন।

কিছুক্ষণ এলোমেলো নানা বিষয়ে কথাবার্তার পর বিদেশীদের একজন বললেন, 'মিসেস চ্যাটার্জি, আপনার হিউম্যান প্রোজেক্ট ঘুরে দেখার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি।'

পারমিতা বললেন, 'নিশ্চয়ই দেখাব।' বলতে বলতেই কী মনে পড়ে যেতে দ্রুত টপিক বদলে ফেললেন, 'ঐ দেখুন, আপনাদের সঙ্গে এঁদের আলাপ করিয়ে দিতেই ভুলে গেছি।' বলে অশোকদের দেখালেন।

পারমিতা প্রথমে বিদেশী অতিথিদের পরিচয় দিলেন। আমেরিকান টি-ভি কোম্পানি থেকে এসেছেন তিনজন—স্ট্যানলি গার্নার, আর্থার মরিস, আর রবার্ট হ্যাসেট। কনস্যুলেট থেকে এসেছেন ডেভি হ্যারিংটন। ওয়েস্ট জার্মানির যে সাংবাদিকটি এসেছেন তাঁর নাম মিস্টার হ্যান্স গাণ্টারম্যান।

লীনার পরিচয় দেবার পর অশোকের পরিচয়টা এই ভাবে দিলেন পারমিতা, 'হী ইজ এ রেভোলিউসানারি অ্যামাং দ্য ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টস। টোটালি ডিফারেণ্ট ফ্রম দি হোল স্পীসিজ অফ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল টাইকুন্‌স।' বলে একজন দারুণ এক্সপার্ট ইম্প্রেসারিওর মত অশোকের পুরো ব্যাকগ্রাউণ্ডটা দু-তিন মিনিটের ভেতর জানিয়ে দিলেন।

টি-ভির লোকেরা আর জার্মান সাংবাদিকটি প্রায় লাফিয়ে উঠলেন। ইণ্ডিয়ার মত মিক্সড ইকনমির দেশে যেখানে ক্যাপিটালিস্ট সিস্টেম পাবলিক আণ্ডারটেকিংগুলোর গা ঘেঁষে জাঁকিয়ে বসে আছে সেখানে অশোককে এনে একটা টপমোস্ট ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এম্পায়ারের মাথায় বসিয়ে দেওয়া শুধু চমকে দেবার মতই ঘটনা নয়, ইণ্ডিয়ার মত ডেভলাপিং কান্ট্রির পক্ষে দুর্দান্ত এক এক্সপেরিমেণ্টও। ইওরোপ, আমেরিকার মত মিশ্র অর্থনীতির দেশেও এরকম এক্সপেরিমেণ্ট হয়েছে

কিনা সন্দেহ। ওঁরা সবাই গভীর আগ্রহে অশোকের দিকে ঝুঁকে বললেন, 'আমরা দিনসাতেক ক্যালকাটায় আছি। এর মধ্যে অনুগ্রহ করে যে কোন দিন যদি একটু সময় দেন, আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই। দেশের ইকনমিক প্যাটার্ন ভেঙে দিয়ে কীভাবে আপনি সোসাল চেঞ্জ নিয়ে আসার কথা ভাবছেন আর সে ব্যাপারে কী কাজ করছেন তা জানার জন্য খুবই কৌতূহল হচ্ছে। আপনার একটা ইন্টারভিউ আমাদের দরকার।'

ইণ্ডাস্ট্রির জগতে আসার পর থেকে যার সঙ্গেই দেখা হয় সে-ই এ জাতীয় কথা বলে। অশোক বলল, 'আপনাদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেলে খুশিই হব। কিন্তু কবে আমরা বসতে পারব, এক্ষুণি বলতে পারছি না। আমার সেক্রেটারি চন্দ্রকান্ত রাহেজা আমার সমস্ত প্রোগ্রাম ঠিক করে দেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলে ডেট ফিক্স-আপ করতে হবে। আপনারা কোথায় আছেন বলুন, মিস্টার রাহেজাকে যোগাযোগ করতে বলব।'

টি-ভি'ওলারা আর জার্মান জার্নালিস্টটি সেন্ট্রাল ক্যালকাটার একটা ফাইভ-স্টার হোটেলের নাম এবং সুইট নাম্বার জানিয়ে দিলেন।

আশোক বলল, 'ঠিক আছে, আমার মনে থাকবে।'

আগে থেকেই ব্যবস্থা করা ছিল। দু-তিনটে ছেলে মাটির ভাঁড়ে করে সবাইকে চা দিয়ে গেল। রং দেখেই টের পাওয়া যায়, সস্তা দামের খেলো চা।

পারমিতা বিদেশী অতিথিদের দিকে তাকিয়ে স্নিগ্ধ হেসে বললেন, 'এখানে ভাল ক্রকারির ব্যবস্থা নেই। আমাদের দেশের কোটি কোটি গরীব মানুষ এ রকম মাটির ভাঁড়ে চা খায়। আপনাদের নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হবে।'

পারমিতার কথাগুলো শতকরা একশো ভাগ খাঁটি, কিন্তু কেমন যেন সাজানো মনে হতে থাকে অশোকের। সে যদি তাদের বাড়ি না যেত, এবং পৃথিবীর সবচাইতে দামী কাপে পৃথিবীর সেরা সুগন্ধি চা না খেত তাহলে এই কথাগুলোই যথেষ্ট আন্তরিক শোনাত।

এদিকে অতিথিরা দারুণ ব্যস্তভাবে কোরাসে বলে উঠলেন, 'না-না, একেবারেই না। উই আর গ্ল্যাড টু শেয়ার এভরিথিং উইথ দি সাফারিং অ্যাণ্ড পুওর পীপল। এই মাটির পাত্রে চা খেতে আমাদের একটুও কষ্ট হবে না।'

শুনতে শুনতে অশোক মনে মনে একবার শুধু উচ্চারণ করল, 'শালারা!'

চা খাওয়ার পর পারমিতা বললেন, 'চলুন, এবার আমাদের ওয়েলফেয়ারের কাজ টাজ দেখবেন।'

সবাই উঠে পড়ল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

অশোক আগে লক্ষ্য করেনি, হলঘরটার একধারে টি-ভি ক্যামেরা, ফ্ল্যাশ-লাইট, ক্যামেরা বসাবার জন্য তিন পা-ওলা স্ট্যাণ্ড আগে থেকেই এনে রাখা হয়েছে। টি-ভির লোকেরা হাতে হাতে সে সব তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

দোতলা থেকে নীচে নামতেই পারমিতা বললেন, 'আমাদের এই স্কুল থেকেই শুরু করা যাক।'

অতিথিরা বললেন, 'গ্ল্যাডলি।'

ওপরে ওঠার সময় অশোক লক্ষ্য করেনি, এবার অবাক হয়ে দেখল, নীচের তলায় দু'ভাগে স্কুলের ক্লাস চলছে। একভাগে বয়স্ক ছাত্রদের ক্লাস। এখানে বেশির ভাগেরই বয়স চল্লিশের ওপর। আরেক ভাগে কম বয়সের ছেলেমেয়েদের ক্লাস চলছে। কখন চুপচাপ রবিবারের এই সকালে এই সব ক্লাস শুরু হয়ে গেছে, আগে টের-পাওয়া যায়নি।

একের পর এক ক্লাসের পাশ দিয়ে যেতে যেতে পারমিতা বলতে লাগলেন, 'সারা সপ্তাহ ধরে রোজ তিন সিফ্‌টে আমাদের ক্লাস বসে। সকাল, দুপুর এবং সন্ধ্যায়। এই বস্তির লোকেদের যার যখন সুবিধা সে তখন এসে ক্লাস করে।' বলতে বলতে একটি ছেলেকে ডাকলেন, 'অজিত—'

নবজীবন প্রকল্পের অনেকগুলো যুবক-কর্মী সবার পিছন পিছন

আসছিল। কখন কার ডাক পড়ে সে জন্য তারা শরীরের সব নার্ভ টান টান করে রেখেছে।

একটা পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের ঝকঝকে চেহারার ছেলে সামনে এসে দাঁড়াল। বোঝা গেল সে অজিত। দেখা যাচ্ছে, ভাল চেহারার স্মার্ট যুবকদের নিয়ে নবজীবন প্রকল্পের স্কোয়াড গড়ে তুলেছেন পারমিতা।

পারমিতা অজিতকে বললেন, 'আমাদের স্কুলের উদ্দেশ্য এবং ইতিহাস তুমি এঁদের বলে দাও। আমি এই ক্লাসটায় যাচ্ছি।' বলেই সামনের একটা ক্লাসরুমে ঢুকে পড়লেন। যে বয়স্ক মাস্টারটি সেখানে পড়াচ্ছিলেন তাঁকে কিছুক্ষণের জন্য ছুটি দিয়ে নিজেই পড়াতে শুরু করলেন পারমিতা।

এদিকে টি-ভির ফোটোগ্রাফার ক্যামেরা রেডি করে ছবি তুলে যাচ্ছিলেন। সবগুলো ক্লাসের ছবিই তারা নিয়েছেন, তবে তা অল্পক্ষণের জন্য। কিন্তু পারমিতা যে ক্লাসটা নিচ্ছেন সেখানে টি-ভি ক্যামেরা অনেকটা সময় আটকে রইল। ওধারে যখন ছবি তোলা হচ্ছে ঠিক তখন তার পাশাপাশি অজিত স্কুলের উদ্দেশ্য-টুদ্দেশ্য বলে যাচ্ছিল। ছেলেটির গলার স্বর চমৎকার, ইংরেজির ওপর দখলও দুর্দান্ত। পারমিতা চ্যাটার্জির পূর্ব কলকাতার বস্তিবাসীদের জন্য যে মাল্টিপারপাস ওয়েলফেয়ার প্রোজেক্ট, এই স্কুল তারই যে একটা অংশ এবং সেটা যে খুব ভাল ভাবেই চলছে তার নিখুঁত বিবরণ দিয়ে যাচ্ছে অজিত। তবে তার প্রতিটি কথায় একবার করে পারমিতার নাম এসে যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ পড়াবার পর পারমিতা ক্লাসরুম থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, 'স্কুলের বাকী অংশটা দেখিয়ে আমরা হেল্‌থ সেণ্টারে যাব।'

বাকীটা বলতে লাইব্রেরী, টীচার্স রুম, সায়েন্স ক্লাসের ল্যাবরেটরি দেখিয়ে সামনের পার্কে সবাইকে নিয়ে চলে এলেন পারমিতা।

অবাক হবার মত ব্যাপার। পার্কে এখন কয়েক শো ছেলেমেয়ে ধবধবে ইউনিফর্ম পরে পি-টি করছে। একজন ইনস্ট্রাকটরের নির্দেশে

এক তালে হাত তুলছে, পা তুলছে, ঝুঁকছে, উঠছে, বসছে বা শরীর হেলিয়ে দিচ্ছে।

টি-ভি ক্যামেরায় একটানা ফিজিক্যাল ট্রেনিংয়ের ছবি উঠে যাচ্ছে। আর অজিত সমানে বলছে, 'ওরা আমাদের স্কুলেরই ছেলেমেয়ে। নবজীবন প্রকল্প থেকে ওদের ইউনিফর্ম দেওয়া হয়। একবেলার খাবারও দেওয়া হয়। প্রতি রবিবার সকালে ওরা ফিজিক্যাল ট্রেনিং নেয়।' ইত্যাদি ইত্যাদি।

পারমিতারা এখানে থাকতে থাকতেই ছেলেমেয়েদের ট্রেনিং শেষ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পার্কের একধারে তারা দৌড়ে গিয়ে লাইন দিয়ে দাঁড়াল। সেখানে বিরাট বিরাট টিনের ক্যান নিয়ে ক'টা লোক অপেক্ষা করছিল।

টি-ভির লোকেরা জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার, বাচ্চাগুলো এখানে কিউ করে দাঁড়াল কেন?'

অজিত বলল, 'আমাদের প্রকল্প থেকে পি-টি'র পর ওদের প্রত্যেককে হাফ লিটার করে দুধ দেওয়া হয়। নিউট্রিসানের দরকার তো।'

টি-ভি ক্যামেরা সঙ্গে সঙ্গে সেদিকে ছুটে গেল। টি-ভিরই একজন রিপোর্টার ব্যাটারি সেটের টেপ রেকর্ডার খুলে পর পর ক'টা ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রতি রবিবার তোমরা দুধ পাও?' অজিত বলা সত্ত্বেও সাংবাদিকটির হয়তো পুরোপুরি বিশ্বাস হয়নি। প্লাস্টিকের গেলাসে করে ওধারে দুধ দেওয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। ছেলেগুলোর চোখ ছিল সেদিকে।

অজিত আমেরিকান সাহেবদের কথা বাঙলায় তর্জমা করে দিল। ছেলেরা একসঙ্গে গলা মিলিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, মা আমাদের সব রবিবার দুধ খেতে দেন।'

অজিত ছেলেদের উত্তর আমেরিকানদের কাছে তর্জমা করে দিতেই আমেরিকান এবং জার্মান সাংবাদিকটি জিজ্ঞেস করল, 'হু ইজ মাদার?'

অজিত পারমিতাকে দেখিয়ে বলল, 'ইনি। বস্তির সব মানুষ

এঁকে মা বলে।'

পারমিতা বললেন, 'আপনারা যে ছেলেমেয়েগুলোকে জিজ্ঞেস করে দুধের ব্যাপারটা যাচাই করে নিলেন তাতে আমি খুবই খুশি। আমার বা অজিতের কোন কথাই আপনাদের বিশ্বাস করতে বলছি না। যখন আপনাদের যা মনে হবে, অনুগ্রহ করে এখানকার মানুষজনকে জিজ্ঞেস করে নেবেন।'

দুধ বিতরণ দেখার পর সবাইকে পার্কের আরেক ধারে পাখি দেখাতে নিয়ে যাওয়া হল। তারপর একে একে 'ডলস্' মিউজিয়াম এবং অডিও-ভিস্যুয়াল সেণ্টার। এই সেণ্টারে রয়েছে টি-ভি আর সিনেমা দেখাবার পর্দা, প্রোজেক্টর। পাখি এবং পুতুল এখানকার বাচ্চাদের জন্য। কিন্তু সিনেমা আর টি-ভি সবার জন্য। নানা ফিল্ম প্রতিষ্ঠান আর ফরেন কনস্যুলেট থেকে ভাল ভাল ছবি এনে বস্তির লোকজনকে দেখানো হয়। প্রতি সন্ধ্যায় এখানে হয় টি-ভি, নইলে ফিল্ম শো।

পার্ক থেকে কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা চলে এলো হেল্‌থ সেণ্টারে। এখানে চ্যারিটেব্‌ল ডিসপেন্সারি থেকে শুরু করে সব রকম রোগের জন্য একটা করে ডিপার্টমেণ্ট রয়েছে। তা ছাড়া আছে মেটার্নিটি সেকসান, অপারেশান থিয়েটার এবং পঁচিশ বেডের একটা হাসপাতাল। আর আছে পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র।

ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের ব্যাপারে এখানে যাবতীয় অপারেশনও করা হয়।

হেল্‌থ সেণ্টার এখন জমজমাট। প্রতিটি ডিপার্টমেণ্টেই প্রচুর ভিড় চোখে পড়ছে। ডাক্তাররা পেশেণ্ট দেখছিলেন।

নানা ডিপার্টমেণ্টে ঘোরার সময় টি-ভি ক্যামেরা তার কাজ করে যাচ্ছিল আর অজিত রেডিওর ধারা বিবরণী দেবার মত হেল্‌থ সেণ্টারের ইতিহাস এবং বিভিন্ন কার্যক্রমের কথা বলে যাচ্ছিল।

একসময় সবাই চলে এলো পঁচিশ বেডের ছোট হাসপাতালটায়। আগে থেকেই পঁচিশটা পলিথিনের প্যাকেটে ভাল ভাল দামী ফল

রাখা ছিল। পারমিতা প্রতিটি বেডের কাছে গিয়ে মধুর হেসে একটি করে ফলের প্যাকেট দিলেন। শুধু তাই না, কে কেমন আছে তার খোঁজখবর নিতে লাগলেন।

টি-ভি'র লোকেরাও টেপ রেকর্ডার খুলে পেশেণ্টদের নানা প্রশ্ন করতে লাগলেন। এখানে তাদের কী রকম যত্ন নেওয়া হচ্ছে, কেমন ট্রিটমেণ্ট চলছে, কোন রকম অসুবিধা হচ্ছে কিনা, ইত্যাদি ইত্যাদি। সেই সঙ্গে ক্যামেরাও চলতে লাগল। যথারীতি আগের মতই অজিত দোভাষীর কাজ করে যাচ্ছে।

প্রশ্নের উত্তরে সব রোগীরই এক জবাব। মা অর্থাৎ পারমিতার জন্য তাদের কোন রকম কষ্ট নেই, এখানে চমৎকার চিকিৎসা হয়, যত্নও নেওয়া হয় যথেষ্ট। মা না থাকলে তাদের মত গরীব বস্তিবাসীদের কবেই মরে ফৌত হয়ে যেতে হত।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে পার্কের উত্তর দিকের চাপ-বাঁধা ঘিঞ্জি বস্তির ভেতর অশোকদের নিয়ে এলেন পারমিতা। এখানে নানা বয়সের প্রচুর লোকজন অপেক্ষা করছে। আর মশামারার তেল, ডি-ডি-টি, ব্লীচিং পাউডার, ফিনাইল, লম্বা লম্বা ঝাড়ু, স্প্রেয়ার ইত্যাদি নিয়ে নবজীবন প্রকল্পের একটা বড় স্কোয়াডও দাঁড়িয়ে আছে।

পারমিতা অতিথিদের জানালেন, 'প্রতি রবিবার তাঁরা বস্তি সাফাইয়ের ড্রাইভ নেন। এই নোংরা আনহাইজিনিক আবহাওয়ায় সর্বক্ষণ পৃথিবীর সমস্ত রোগের ভাইরাস ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই সব ভাইরাস না মারলে বস্তির বাসিন্দারা বাঁচবে না।'

সাফাই অভিযানের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে এক সেকেণ্ডও আর দেরি করলেন না পারমিতা। একজন যুবকের হাত থেকে লম্বা ঝাড়ু নিয়ে বস্তি পরিষ্কার করতে শুরু করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাকী সবাইও রাস্তা সাফাইয়ে হাত লাগাল। সেই সঙ্গে মশা মারার তেল আর ব্লীচিং পাউডার ছড়ানোর কাজও চলল।

ঘণ্টা দেড় দুই সাফাইয়ের পর ওরা এবার এলো পার্কের গায়ের সেই প্রোডাকশান-কাম-ট্রেনিং সেণ্টারের লম্বা লম্বা শেডগুলোর তলায়।

এখানে ট্রেনিংয়ের সঙ্গে রোজগারের ব্যবস্থাও রয়েছে।

শেডগুলোর মধ্যে কোথাও রয়েছে লেদ মেশিনের ডিপার্টমেন্ট, কোথাও প্রিন্টিং মেশিন, কোথাও ছোটখাটো ইলেকট্রিকের যন্ত্রপাতি তৈরির ব্যবস্থা, কোথাও চামড়া বেত প্লাস্টিক ইত্যাদি দিয়ে নানা রকম জিনিসপত্র তৈরির কারখানা।

পারমিতা জানালেন, 'এখানকার যাবতীয় প্রোডাক্ট বাজারে বিক্রির ব্যবস্থা আছে। তাতে যা আয় হয় তার বেশির ভাগই এখানকার ট্রেইনীদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। পারমিতার ইচ্ছা, এই ট্রেনিং-কাম-প্রোডাকশন সেন্টারটাকে খুব বড় আকারে গড়ে তুলবেন, যাতে অনেক অনেক বেশি মানুষের কর্মসংস্থান হয়।'

এই সেন্টারের সবগুলো ডিপার্টমেন্টেই এখন পুরোদমে কাজ চলছে। টি-ভি ক্যামেরা অনবরত সে সবের ছবি তুলে যেতে লাগল।

সেন্টারের সবগুলো সেকশান ঘুরে ঘুরে দেখতে অনেকটা সময় লেগে গেল। সূর্যটা এতক্ষণ ইস্ট ক্যালকাটার ঘিঞ্জি বস্তির মাথায় সিনেমার ফ্রিজ শটের মত স্থির দাঁড়িয়ে ছিল। এবার সেটা আকাশের ঢাল বেয়ে পশ্চিম দিকে নামতে শুরু করেছে। কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখে হঠাৎ খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লেন পারমিতা। বিদেশী অতিথি এবং অশোকদের বললেন, 'দেড়টা বেজে গেছে। চলুন চলুন, এবার খেয়ে নেওয়া যাক।'

অতিথিদের কারো এতক্ষণ যেন খেয়াল ছিল না। এবার তাঁরা একই সঙ্গে কোরাসে বলে উঠলেন, 'ফাইন। সত্যি ভীষণ খিদে পেয়ে গেছে। কিন্তু এখানে আবার খাওয়া-দাওয়ার অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছেন নাকি?'

খাওয়ার কথায় আচমকা টালিগঞ্জের ব্যারাক-বাড়ির ছবিটা অশোকের চোখের সামনে ফুটে উঠল। এখানে আসার আগে সে ঠিকই করে রেখেছিল আজ দুপুরে টালিগঞ্জে গিয়ে হরকাকা, মালতী কাকিমা আর নান্টু ঝন্টুদের সঙ্গে পাশাপাশি বসে খাবে। রেখাকেও ডেকে আনবে। কত কাল ওদের সঙ্গে বসে খাওয়া হয়নি।

অশোক পারমিতাকে বলল, 'যদি কিছু মনে না করেন একটা কথা বলব—'

পারমিতা বললেন, 'নিশ্চয়ই।'

'আমাকে এবার যেতে হবে। অন্য জায়গায় আমার একটা জরুরী কাজ আছে।'

'কাইণ্ডলি দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর যান। সবাই একসঙ্গে বসে খাব বলে আগে থেকেই ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই বস্তির লোকজনও আমাদের সঙ্গে খাবে।'

অশোক কিছু বলার আগে পারমিতা আবার বলে উঠলেন, 'অবশ্য—'

'কী?'

'খাওয়ার আয়োজন খুবই সামান্য। নো স্যুপ, নো পুডিং, নো মীট—একেবারে সাধারণ ডাল ভাত। আপনার খুবই অসুবিধা হবে। তবে একসঙ্গে বসে খাওয়ার আনন্দও তো আছে।'

পারমিতার কথাগুলো এমনিতে খুবই নিরীহ ধরনের। কিন্তু ওপরের ক্যামোফ্লেজটা সরিয়ে দিলে তার নীচে তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম একটা খোঁচা বা বিদ্রূপ রয়েছে কী? টালিগঞ্জের ব্যারাক-বাড়িতে রেশনের মোটা চালের ভাত, জলের মত পাতলা মসুরির ডাল এবং ডাঁটা চচ্চড়ি খেয়েই তো জীবনের পঁচিশ ছাব্বিশটা বছর কাটিয়ে দিয়েছে সে। কবে আর জাপানী বা কোরিয়ান ক্রকারিতে করে স্যুপ, পুডিং আর চিকেন পোলাও খেয়েছে? বহুকালের পুরনো, জঘন্য, সাধারণ মানুষের রক্ত শুষে নেওয়া সেমি-কলোনিয়াল সেমি-ক্যাপিটালিস্ট ইকনমিক প্যাটার্ন ভেঙে দেবার জন্য এই তো সেদিন অশোক সোমদেব চ্যাটার্জিদের ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এম্পায়ারে এসে ঢুকল। তারপরই জীবনে প্রথম ভাত-রুটি-ডাল-চচ্চড়ির বাইরে পৃথিবীর সেরা সেরা সুখাদ্যের স্বাদ পেতে শুরু করেছে। কিন্তু তা আর ক'দিনের জন্য? তীক্ষ্ণ চাপা গলায় অশোক বলল, 'মানুষের আয়ু কত বছর বলে আপনার মনে হয় মিসেস চ্যাটার্জি?'

পারমিতা একটু অবাক হলেন। দুপুরে খাওয়ার সঙ্গে মানুষের আয়ুর সম্পর্ক কী তিনি বুঝে উঠতে পারছিলেন না। আস্তে করে বললেন, 'ইণ্ডিয়ানদের লঞ্জিভিটি তো বেড়ে গেছে। এখন অ্যাভারেজে সত্তর পঁচাত্তর বছর।'

অশোক বলল, 'তা হলে জেনে রাখুন ডাল-ভাত খেয়েই আমার লাইফের ওয়ান-থার্ড কেটে গেছে। নিজের অতীতকে মাত্র ক'টা দিনে আমি ভুলে যাইনি।' একটু থেমে ফের বলল, 'আমি এখানেই খেয়ে যাব মিসেস চ্যাটার্জি।'

পারমিতা কখনও কোন কারণেই উত্তেজিত ক্ষুব্ধ বা অসন্তুষ্ট হন না। হলেও বাইরে তার প্রকাশ নেই। তাঁর কথাবার্তা, হাসি, আচরণ—সব কিছুই মার্জিত, মধুর এবং উত্তেজনাশূন্য। স্নিগ্ধ হেসে তিনি বললেন, 'ধন্যবাদ।'

ট্রেনিং-কাম-প্রোডাকসন্স সেণ্টারে সাবান তোয়ালে ইত্যাদি আনিয়ে নেওয়া হল। এখানেই অশোকদের হাত-পা ধুয়ে নিতে বললেন পারমিতা। তারপর সবাইকে নিয়ে আরেক বার সামনের পার্কটায় গেলেন।

আশ্চর্য ব্যাপার! পার্কটাকে এখন আর চেনা যায় না। লম্বা লম্বা অগুনতি অ্যালুমিনিয়ামের রডের মাথায় লাল-নীল-সবুজ-হলুদ কাপড় লাগিয়ে গোটা পার্ক জুড়ে একটা ইমপ্রোভাইজড প্যাণ্ডেল বানিয়ে ফেলা হয়েছে। আর বসে খাবার জন্য অসংখ্য সারিতে চাটাইয়ের আসন পাতা। প্রতিটি আসনের সামনে কলার পাতা, জলভর্তি মাটির গেলাস সাজানো। কখন যে এত সব কাণ্ড কারখানা হয়ে গেছে কে জানে।

বেলেঘাটার এই বস্তিতে আসার পর থেকে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করছে অশোক। যেখানে তারা গেছে—স্কুল বা প্রোডাকসন সেণ্টার, পি-টি'র মাঠ বা বস্তির ভেতরে—সব জায়গায় পারমিতা চ্যাটার্জির নবজীবন প্রকল্পের একেকটা স্কোয়াড নিঃশব্দে প্রায় মেশিনের মত

কাজ করে যাচ্ছে। কোন কাজের মধ্যেই কোথাও এতটুকু খুঁত নেই। পারমিতার এই সব ছেলেরা অত্যন্ত ট্রেইণ্ড, অদ্ভুত এক ডিসিপ্লিনে তাদের প্রতিটি মুভমেণ্ট বাঁধা। স্বীকার করতেই হবে, ভদ্রমহিলা সত্যিই ম্যাজিক জানেন।

বস্তির প্রচুর লোকজন পার্কে অপেক্ষা করছিল। শুধু অশোকরাই না, বোঝা গেল, তাদেরও এখানে খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।

জার্মান সাংবাদিক গাণ্টারম্যান বললেন, 'কমিউনিটি লাঞ্চের অ্যারেঞ্জমেণ্ট করেছেন দেখছি।'

পারমিতা বললেন, 'হ্যাঁ, আপনাদের অনারে।'

'স্ট্যাটস ফাইন!'

কনস্যুলেটের ডেভি হ্যারিংটন বললেন, 'এতদিন বড় পার্টিতে ইণ্ডিয়ার এলিটিস্ট বা পলিটিক্যাল লীডারদের সঙ্গে খানা খেয়েছি। কিন্তু এখানকার কমন পীপল, বিশেষ করে পভার্টি লাইনের নিচেকার মানুষজনের পাশে বসে খাওয়ার সুযোগ হয়নি। ইট উড বী এ গ্র্যাণ্ড এক্সপীরিয়েন্স। অ্যাণ্ড উই আর গ্রেটফুল টু ইউ মিসেস চ্যাটার্জি, ফর গিভিং আস দিস একসেলেণ্ট অপরচুনিটি।'

পারমিতা হাসলেন। বললেন, 'অনেক, অনেক ধন্যবাদ। এবার অনুগ্রহ করে খেতে বসুন।'

টি-ভি ফোটোগ্রাফার স্ট্যানলি গার্নার বললেন, 'আপনারা বসে যান। আমি পরে খাব। এই উনিক কমিউনিটি লাঞ্চের ছবি টি-ভি'তে ধরে রাখা দরকার।' ক্যামেরা ঘাড়ে করে তিনি পার্কের অন্য দিকে চলে গেলেন।

পারমিতা তাঁর অতিথিদের নিয়ে খেতে বসলেন। তাঁর ডান পাশে বসেছেন রবার্ট হ্যাসেট, ডেভি হ্যারিংটন, হ্যান্স গাণ্টারম্যান, আর্থার মরিস, বাঁ পাশে অশোক এবং লীনা।

ওরা বসবার পরই ঝপ ঝপ করে বস্তির লোকেরা বসে পড়ল। দু'মিনিটের মধ্যে পার্কটা বোঝাই হয়ে গেল। এক কোণে কুড়ি পঁচিশটা ছেলে ভাতের বালতি, ডালের বালতি, নানা রকম

ভাজা-ভুজির বড় বড় থালা ইত্যাদি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, সবাই বসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা পরিবেশন শুরু করল।

পাশাপাশি বসে চোখের কোণ দিয়ে অশোক পারমিতাকে দেখতে লাগল। যে শাড়ি আর জামা পরে তিনি বস্তি ঝাঁট দিয়েছেন, মশামারা তেল আর ডি-ডি-টি ছড়িয়েছেন, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অতিথিদের ঘিঞ্জি, নোংরা, নরকের মত বেলেঘাটার এই স্লাম এরীয়া দেখিয়েছেন, হুবহু সেই পোশাকেই খেতে বসে গেছেন। কয়েক শো কোটি টাকার অ্যাসেট যাঁদের, তেমন এক সুবিশাল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এম্পায়ারের টপমোস্ট ব্যক্তিটির স্ত্রী পারমিতা। যাঁর বাড়ির গোটাটাই এয়ার কণ্ডিশাণ্ড। যাঁর দু'হাজার স্কোয়ার ফুট ডাইনিং রুমে ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ বা ডিনারের সময় এক ডজনেরও বেশি বেয়ারা বাবুর্চি তটস্থ হয়ে দমবন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকে, তিনি কিনা ঘিঞ্জি বস্তির একফালি পার্কে খেলো কাপড়ের লাল-নীল চাঁদোয়ার তলায় পৃথিবীর সব চাইতে গরীব, সব চাইতে হতচ্ছাড়া চেহারার একদল নোংরা হাভাতে টাইপের লোকের পাশে বসে সোনামুখ করে মোটা মোটা কাঁকরওলা চালের ভাত, কাল্‌চে বিউলির ডালে মেখে খেয়ে যাচ্ছেন। ভদ্রমহিলাকে মনে মনে দশ হাজার স্যালুট করতে ইচ্ছা হল অশোকের।

পারমিতা অশোককে কিছুক্ষণ আগে যা বলেছিলেন, বিদেশী অতিথিদেরও এবার সেই একই কথা বললেন, 'আপনাদের খেতে নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু কিছুই করার নেই। আমাদের দেশের এইট্টি পারসেণ্ট মানুষ রোজ এই খাদ্যও জোটাতে পারে না।'

অশোক খেতে খেতে আমেরিকান আর জার্মান সাহেবদের দিকে তাকাল। পারমিতা এঁদের এক দারুণ ক্যাঁচাকলে ফেলে দিয়েছেন। মুখে পরিতৃপ্তি আর আনন্দের ঝলমলে হাসিটি ফুটিয়ে ওঁরা গুমো আতপের পিণ্ডি খেয়ে যাচ্ছেন ঠিকই কিন্তু টের পাওয়া যাচ্ছে ওঁদের পাকস্থলী থেকে অন্নপ্রাশনের অন্ন (আদৌ যদি ওঁদের অন্নপ্রাশন হয়ে থাকে) উঠে আসছে।

অশোক এবার তার ডান পাশে লীনার দিকে তাকাল। স্যার

হরকিষণ দাস দেশাইর মেয়ের মুখ দেখে মনে হচ্ছে গন্ধওলা গুমো আধপচা আতপের ডেলা গলা দিয়ে নামাতে নামাতে যে কোন সময় তার স্ট্রোক হয়ে যাবে। এ রকম একখানা লাঞ্চ খেতে হবে, আগে জানতে পারলে এখানে সে কিছুতেই আসত না। একটু মজা করার জন্য অশোক আস্তে করে ডাকল, 'লীনা—'

লীনা মুখ ফেরাল, 'কিছু বলবে?'

অশোক ঘাড় হেলিয়ে দিল, 'হ্যাঁ।'

'কী?'

সঙ্গে সঙ্গে কিছু না বলে লীনার মুখচোখ লক্ষ্য করতে লাগল অশোক। সোডার মত তার পেটের ভেতর থেকে হাসি যেন ফেনিয়ে উঠে আসতে চাইছিল। অনেক কষ্টে হাসিটাকে আটকে রেখে এক সময় সে জিজ্ঞেস করল, 'প্রোলেটারিয়েট লাঞ্চ কি রকম লাগছে?'

লীনার মুখে কাল্‌চে একটা ছায়া পড়েই মিলিয়ে গেল। একটু হাসতে চেষ্টা করল সে, 'নট ব্যাড। আই অ্যাম এনজয়িং।'

অশোক তার দিকে ঝুঁকে গলার স্বর ঝপ করে অনেকখানি নামিয়ে বলতে লাগল, 'মাদাম, স্ট্যাটিসটিক্স আর বই-টই ঘেঁটে ডেস্টিচুটদের ওপর থীসিস খাড়া করা এক ব্যাপার আর হ্যাভ-নটদের পাশাপাশি বসে ট্যাড়স-কুমড়োর চচ্চড়ি দিয়ে পচা আতপের পিণ্ডি গেলা টোটালি ডিফারেণ্ট থিং।'

আবছা গলায় লীনা কিছু একটা বলল কিন্তু তার একটি বর্ণও বোঝা গেল না।

অশোক ফের বলল, 'তুমি এখানে না এলেই পারতে লীনা। যেভাবে চালাচ্ছিলে সেভাবে চালালেও তোমার ইউনাইটেড নেশন্‌সে স্লাম-ডোয়েলারদের রিপ্রেজেণ্টেটিভ হওয়া কেউ আটকাতে পারত না। শুধু শুধু এখানে কষ্ট করতে এলে।'

লীনার মুখ লাল হয়ে উঠল। সে বলল, 'তুমি কি মনে কর, বস্তির লোকজন সম্পর্কে আমার কোন রকম সিমপ্যাথি নেই?'

জিভের ডগায় চুক চুক করে একটু শব্দ করল অশোক। তারপর

মজাদার একটা ভঙ্গি করে বলল, 'আরে কী যে বল। তোমার মত জেনুইন হিউম্যানিটারিয়ান ক'টা আর হয়। তবে—'

সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল লীনা, 'তবে কী?'

'স্লাম-ডোয়েলারদের পাশে বসে খেয়ে একটা দারুণ ব্যাপারই করলে। ইট্স এ রেড লেটার ডে অফ ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি।' বলে চোখ কুঁচকে তাকাল অশোক, 'লাইফে এ রকম কষ্ট নিশ্চয়ই এই প্রথম করলে, তাই না?'

লীনা চুপ।

অশোক বলল, 'নিশ্চয়ই এটাই শেষ?'

লীনা স্থির চোখে অশোককে দেখতে দেখতে বলল, 'তুমি কিন্তু বিলো দ্য বেল্ট হিট করে যাচ্ছ অশোক।'

অশোক বলল, 'বীলিভ মী, একেবারেই না। সিনসিয়ারলি বলছি।' আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল সে, তার আগেই ওধার থেকে ফরেনারদের গলা শোনা গেল।

ডেভি হ্যারিংটন বলছেন, 'মিসেস চ্যাটার্জি, ইউ হ্যাভ ডান এ সুপার্ব জব। সাফারিং হিউম্যানিটির জন্য এই সাব-কন্টিনেণ্টে সম্পূর্ণ একা এ কাজ আগে আর কেউ করেছেন বলে আমাদের অন্তত জানা নেই।'

হ্যান্স গাণ্টারম্যান বললেন, 'এই সোসাল সারভিসের কথা হোল ওয়ার্ল্ডকে জানানো দরকার। বিশেষ করে অ্যাডভান্সড কান্ট্রি-গুলোকে। একজন মহিলা সম্পূর্ণ একক প্রচেষ্টায় কী বিরাট কাজ করছেন, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যেত না।'

টি-ভি কোম্পানির আর্থার মরিস বললেন, 'আমরা যে টি-ভি ফিল্ম তুলে নিয়ে গেলাম, ইওরোপ আর আমেরিকায় তা দেখালে সেনসেসন পড়ে যাবে। এই মহৎ কাজের উপযুক্ত সম্মান প্রয়োজন। আমেরিকার প্রত্যেকটা শহরে যাতে টি-ভি'তে মিসেস চ্যাটার্জির এই মনুমেণ্টাল ওয়ার্ক দেখানো যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে।'

গাণ্টারম্যান বললেন, 'ওয়ার্ল্ডের হিউম্যান ওয়েলফেয়ার অর্গানাই-

জেসনগুলোর দৃষ্টি যেভাবেই হোক ইস্ট ক্যালকাটার এই নবজীবন প্রকল্পের দিকে ফেরাতেই হবে।'

চারদিক থেকে স্তুতি শুনতে শুনতে এবং তা উপভোগ করতে করতে লাজুক হাসছেন পারমিতা। কীভাবে কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে হাসলে তাঁকে সুপারস্টার ফিল্ম হিরোইনদের মত দেখায় সেটা তিনি জানেন। আস্তে ঘাড় ফিরিয়ে পারমিতা অশোকের দিকে তাকালেন। বাঙলায় বললেন, 'আপনি তো কিছুই বলছেন না।'

অশোক বলল, 'কী বলব! যা বলার আপনার গেস্টরাই তো বলছেন।'

'তবু—'

'ভি-আই-পী'রা এত কথা বলছে। তারপর আমার মত লোকের কমেন্টের কী দরকার?'

'আমার দরকার আছে।'

'ফরেনাররা এত মাখন লাগাচ্ছে, তাতেও হচ্ছে না! কত বাটার আপনার প্রয়োজন?' বলেই হঠাৎ কিছু মনে পড়তে থেমে গেল অশোক। বিরক্তির মাথায় মাখন লাগাবার কথাটা বলা ঠিক হয়নি। কথাগুলো বেজায় অশোভন, খানিকটা ইতরামোর গন্ধ তাতে মাখানো। নীচু গলায় ফের সে বলল, 'এক্সকিউজ মাই ল্যাঙ্গুয়েজ। আফটার অল বস্তির ব্যাকগ্রাউণ্ডটা আমার পক্ষে ঝেড়ে ফেলা তো সম্ভব না।'

পারমিতা অশোকের শেষ কথাগুলো যেন শুনতেই পাননি। তার দিকে আরো অনেকটা ঝুঁকে দারুণ আগ্রহের গলায় বললেন, 'আপনার মতামত আমার সব চাইতে বেশি দরকার মিস্টার ব্যানার্জি। লাইফের বেশীর ভাগ সময় আপনি এই রকম স্লামে কাটিয়েছেন। আমাদের নবজীবন প্রকল্পে কোথায় কী ত্রুটি আছে, আপনি ছাড়া আর কারো পক্ষে ধরা সম্ভব না। স্লাম সম্বন্ধে এঁদের ধারণা সুপার-ফিসিয়াল, আপনিই শুধু রুটটা জানেন।'

অশোকের মনে হয়, পারমিতা এই যে কথাগুলো বললেন, তা কি

নিছকই তাকে খুশি করার জন্য ? তার মতো একজন স্লাম-ডোয়েলার যদি তাঁর এ জাতীয় প্রকল্পের প্রশংসা করে সেটার দাম অনেক। অশোক উত্তর দিল না।

পারমিতা আবার বললেন, 'কী হল, চুপ করে আছেন যে—'

অশোক তার চোখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'আমার কমেণ্ট শুনলে আপনার কিন্তু খারাপ লাগবে। আমি কিছুতেই অন্য সবার মতো ফ্ল্যাটারি করতে পারব না।'

পারমিতা কয়েক সেকেণ্ড গম্ভীর হয়ে রইলেন। তাঁর মুখে প্রায় সারাক্ষণ চিরস্থায়ী একটা হাসি লেগেই থাকে। সেই হাসিটা আবার ফিরে এলো। বললেন, 'ফ্ল্যাটারি আমি একেবারেই পছন্দ করি না মিস্টার ব্যানার্জি। আই ওয়ান্ট রাইট অ্যাণ্ড স্ট্রেট থিংস, ইভন ইফ দোজ আর রুড অ্যাণ্ড হার্ড অ্যাট টাইমস্। আপনার যা মনে হয়েছে তাই বলুন। আই অ্যাম রেডি টু অ্যাকসেপ্ট এনিথিং—'

'তবু—'

পারমিতা বললেন, 'দ্বিধাটা কিসের ?'

অশোক বলল, 'এটা তো ঠিক, মিস্টার চ্যাটার্জি আমাকে এনে এই ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এম্পায়ারের মাথায় বসিয়ে দিয়েছেন। তাঁর স্ত্রীর মুখের ওপর আনপ্লেজাণ্ট, মানে অপ্রীতিকর মন্তব্য করা বোধ হয় ঠিক হবে না।'

পারমিতা ঈষৎ তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, 'মুখে বলছেন, নিজের ব্যাক গ্রাউণ্ড ভোলেন নি। আমার কিন্তু মনে হচ্ছে আপনি নিজের ক্লাস ক্যারেক্টার ভুলে যাচ্ছেন মিস্টার ব্যানার্জি। এটা কিন্তু আপনার কাছে আশা করিনি।'

অশোক চমকে উঠল, 'কি রকম ?'

'আপনি আমাদের বিশাল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এম্পায়ারে এসেছেন একটা বিরাট মিশন নিয়ে, দেশের ইকনমিক আর সোসাল প্যাটার্ণ চেঞ্জ করে দেবার জন্যে। নিশ্চয়ই শিল্পপতি সোমদেব চ্যাটার্জির স্ত্রীকে খুশি করবার জন্যে নয়।'

নাক-মুখ ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল অশোকের। সে বলল, 'কী বলতে

চান আপনি ?'

পারমিতা বললেন, 'আপনার এখনকার আচরণ দেখে আর কথা-বার্তা শুনে একটা কথা ভাবতে ইচ্ছা করে।'

'কী কথা ?'

'মিড্‌ল ক্লাস বা তার লোয়ার লেভেলের লোকজনদের মতো আপনিও একজন কেরিয়ারিস্ট। বিপ্লবের বড় বড় বুলিগুলো নেহাতই ফাঁপা স্লোগান।'

দাঁতে দাঁত চেপে চাপা গলায় অশোক বলল, 'তার মানে ?'

পারমিতা বললেন, 'হঠাৎ প্রচুর কমফোর্ট আর প্রচণ্ড ক্ষমতা পেয়ে আপনার মাথা ঘুরে গেছে। এত আরাম, এত অঢেল অ্যাফ্লুয়েন্স আপনার সব আগুন জুড়িয়ে দিচ্ছে। এখন সত্যি কথা বলতে আপনার সাহস হয় না, পাছে আচমকা যা পেয়েছেন তা হারাতে হয়—'

মাথার ভেতর হঠাৎ বিস্ফোরণ ঘটে যায় অশোকের। পারমিতা যা বলেছেন তার সবটাই কি ভিত্তিহীন, অসার ? নিজের মধ্যে এক সময় টালিগঞ্জের বস্তিবাসী সেই সীনিক হতাশ ভবিষ্যৎহীন একগুঁয়ে ছেলেটির অস্তিত্ব অনুভব করতে থাকে সে। সতেজ ভঙ্গিতে বলে, 'ম্যাডাম, আপনার নবজীবন প্রকল্পের অ্যাক্টিভিটি দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল, আপনি ওয়ার্ল্ডের বেস্ট পাবলিসিটি অর্গানাইজেসনের কান ধরে শিখিয়ে দিতে পারেন, সেল্‌ফ-অ্যাডভ্যার্টাইজমেণ্ট কী বস্তু। যে উদ্দেশ্যে আপনি এ সব করছেন তার সাকসেস হানড্রেড পারসেণ্ট গ্যারাণ্টেড।'

পারমিতা বললেন, 'কী উদ্দেশ্যে আমি এসব করছি বলে আপনার ধারণা ?'

'সেটা ফিরে যাবার সময় বলব। বিদেশী অতিথিরা আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্য বার বার এদিকে তাকাচ্ছে। খুব সম্ভব নতুন করে আবার বাটার লাগাতে চায়। প্লীজ ওদের অ্যাটেণ্ড করুন।'

'তা হলে ফেরার সময় আমার গাড়িতে যাবেন।'

'আমার আপত্তি নেই।'

পারমিতা মুখ ফিরিয়ে বিদেশী অতিথিদের দিকে তাকালেন।

তিন

বস্তিবাসীদের পাশাপাশি বসে গ্র্যাণ্ড কমিউনিটি লাঞ্চ সারতে সারতে আড়াইটে বেজে গেল। আর তখনই ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে সময় মিলিয়েই যেন চন্দ্রকান্ত রাহেজা একটা দামী লিমুজিন নিয়ে বেলেঘাটার এই স্লামে এসে হাজির হলেন। অশোকের মনে পড়ে গেল, বিকেল তিনটে থেকে রাত আটটা পর্যন্ত কম করে পাঁচটা ফাংশনে যেতে হবে। তারপর ক্লাব হয়ে বাড়ি।

এদিকে ফরেন টি-ভি'ওলা এবং সাংবাদিকদের এখানকার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাঁরা ক্যামেরা-ট্যামেরা একটা স্টেশন ওয়াগনে তুলে নিতে লাগলেন।

অশোক বলল, 'এবার কিন্তু আমাকে যেতে হবে মিসেস চ্যাটার্জি।'

পারমিতা বললেন, 'আমরাও আর থাকছি না। আজকের মতো এখানকার কাজ শেষ হয়েছে।' একটু থেমে বললেন, 'আপনি এখন কোথায় যাবেন বলুন—'

অশোক বলল, 'আমি ঠিক বলতে পারব না। আমার গাইডকাম-প্রোগ্রাম সেটার মিস্টার রাহেজা যেখানে নিয়ে যাবেন সেখানেই যাব।'

রাহেজা কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। সম্ভ্রমের সুরে পারমিতাকে বললেন, 'প্রথমে হর্টিকালচার গার্ডেনে যাব। ওখানে একটা ফ্লাওয়ার শো উদ্বোধন করতে হবে।'

পারমিতা তাঁকে বললেন, 'ঠিক আছে। আমাকে এখন একবার নিউ আলিপুর যেতে হবে। মিস্টার ব্যানার্জি আমার গাড়িতে হর্টিকালচার গ্রাউণ্ড পর্যন্ত যেতে পারবেন। আপনি আপনার 'কার' নিয়ে আমাদের সঙ্গে চলুন।'

লীনা খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। সে বলল, অশোকের সঙ্গে আমার যে একটু দরকার আছে আন্টি।'

পারমিতা বললেন, 'তুমিও আমাদের সঙ্গে আসতে পারো।'

'ফাইন। মিস্টার রাহেজার মতো আমিও আমার গাড়িটা নিয়ে আপনাদের ফলো করে যাই।'

পারমিতা আস্তে করে তাঁর স্বর্ণাভ সুগোল গ্রীবা হেলিয়ে বিদেশী অতিথিদের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং স্নিগ্ধ হেসে প্রত্যেকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জানালেন, খুব তাড়াতাড়িই তাঁদের সঙ্গে আবার যোগাযোগ করবেন।

কিছুক্ষণ পর দেখা গেল বিদেশী টি-ভি কোম্পানির স্টেশন ওয়াগন, দূতাবাসের লিমুজিন, পারমিতা চ্যাটার্জির পুরনো মডেলের সেই গাড়িটা, লীনার টু-সীটার আর রাহেজার ইমপোর্টেড কার—সব মিলিয়ে বিরাট এক কনভয় ইস্ট ক্যালকাটার এই বিশাল বস্তি থেকে বেরিয়ে বেলেঘাটা মেইন রোডে গিয়ে পড়ল।

পারমিতার গাড়িতে ব্যাকসীটে পাশাপাশি বসে ছিলেন পারমিতা এবং অশোক।

পারমিতা বললেন, 'এবার শুরু করুন—'

অশোক কিছুটা অন্যমনস্ক ছিল। পারমিতার কথা ঠিক বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, 'কী শুরু করব?'

'বাঃ, এর মধ্যে ভুলে গেলেন। বেশ, ধরিয়ে দিচ্ছি।' বলে একটু থামলেন পারমিতা, তারপর মনে মনে বক্তব্যটা গুছিয়ে নিয়ে সোজা অশোকের চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কী উদ্দেশ্যে আমি এই নবজীবন প্রকল্প করেছি বলে আপনার ধারণা?'

সমস্ত নার্ভের ভেতর একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেল যেন অশোকের। চাপা তীক্ষ্ণ গলায় সে বলল, 'আত্মপ্রচার ম্যাডাম, স্রেফ আত্মপ্রচার।'

একটু চমকে উঠলেন পারমিতা। পরক্ষণে চোখ মুখ থেকে চমকটা মুছে দিয়ে হেসে হেসে বললেন, 'শুধুই আত্মপ্রচার?'

'সার্টেনলি। ইওরোপ-আমেরিকায় আপনার নাম ছড়িয়ে যাবে। সাফারিং হিউম্যানিটির জন্য আপনি যা করেছেন বা করে যাচ্ছেন তার

জন্য হোল ওয়ার্ল্ডের সব নিউজপেপার, টি-ভি আর রেডিও দিনরাত আপনার নামে ড্রাম বাজিয়ে যাবে। তারপর ফরেন থেকে ডজন ডজন ইনভিটেসন আসবে। বড় বড় ডেলিগেসনের লীডার হয়ে আজ লণ্ডন, কাল নিউইয়র্ক, পরশু ফ্রাঙ্কফুর্ট কি কোপেনহেগেন যাবেন। সেই সঙ্গে আসবে গাদা গাদা রিওয়ার্ড, প্রাইজ, নানা ইউনিভার্সিটির অনারারি ডক্টরেটশিপ। অনার, ফেম ছাড়া দিকে দিকে আপনার নামে জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ আওয়াজে মানুষের কানের পর্দা ফেটে যাবে, তাই না ম্যাডাম?'

পারমিতার মুখ থেকে এই মুহূর্তে পার্মানেন্ট সেই হাসিটার অনেকখানিই কেউ যেন রবার দিয়ে ঘষে ঘষে তুলে দিতে লাগল। তিনি বললেন, 'এই উদ্দেশ্যেই তা হলে আমি বস্তির এই সব ওয়েল-ফেয়ারের পরিকল্পনা নিয়েছি?'

'এ ছাড়া আর কিছুই তো আমার মনে হচ্ছে না।'

'আমার এই সব কাজের মধ্যে কি কোনরকম সিনসিয়ারিটি নেই মিস্টার ব্যানার্জি?'

অশোক বলল, 'নিশ্চয়ই আছে।'

পারমিতা জিজ্ঞাসু চোখে তার দিকে তাকালেন। বললেন, 'তা হলে?'

অশোক খানিকটা ঝুঁকে বলল, 'এই সিনসিয়ারিটিটা বস্তির লোকজনের জন্য কতটা আর কতটা নিজের জন্য, সেটা ভেবে দেখতে হবে।'

'নিজের জন্য বলতে?' পারমিতা জানতে চাইলেন।

অশোক বলল, 'ভেরি সিম্পল ম্যাডাম। একটু আগেই আপনাকে তা বলেছি। তবু আরো একবার বলি। এই যে আপনি লালপাড় রদ্দি শাড়ি পরে বস্তি ঝাঁট দেন, মশামারা মাছিমারা তেল স্প্রে করেন বা স্লাম-ডোয়েলারদের সঙ্গে বসে পচা আতপ চালের পিণ্ডি খান—এত যে স্যাক্রিফাইস করেন তা কি অকারণে? এর পেছনে একটাই মোটিভ—দেশে-বিদেশে নিজের নাম ছড়ানো।' দাঁতের তলায় যত আগুন

ছিল, সব উগরে বার করে দিল অশোক।

পারমিতা প্রতিবাদ করলেন না, উত্তেজিত হলেন না। রক্তাভ ঠোঁটে, খাঁজ-কাটা আশ্চর্য সুন্দর চিবুকে, চোখের মণিতে সেই স্নিগ্ধ হাসিটা আরো রমণীয় করে শুধু বললেন, 'নিজের সীনিক ব্যাক-গ্রাউণ্ডটা আপনি ভোলেননি দেখছি। খুবই আশার কথা।'

একটু চুপচাপ।

তারপর অশোকই শুরু করল, 'আমার আরো একটা কথা আছে মিসেস চ্যাটার্জি।'

পারমিতা বললেন, 'অবশ্যই। বলুন—'

'আপনার ঐ সব ওয়েলফেয়ার অ্যাক্টিভিটি দেখে আমার মনে হয়েছে বস্তিবাসীদের মধ্যে আপনি ডিভিসন আনতে চাইছেন।'

কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে রইলেন পারমিতা। তারপর আস্তে আস্তে তাঁর স্বর্ণাভ মসৃণ কপাল কুঁচকে যেতে লাগল। তিনি বললেন, 'আপনার কথা বুঝতে পারলাম না মিস্টার ব্যানার্জি।'

অশোক বলল, 'বুঝিয়ে দিচ্ছি। তার আগে একটা কথা জিজ্ঞেস করি।'

'করুন।'

'আপনি তো স্লাম-ডোয়েলারদের ওয়েলফেয়ারে নিজেকে ডেডিকেট করেছেন। বলুন তো, কলকাতা আর সাবার্বে কত বস্তিবাসী আছে?'

'কারেক্ট ফিগার দিতে পারব না। তবে মনে হয় অ্যাবাউট থ্রি মিলিয়ন মানে তিরিশ লাখের মতো।'

'আর আপনার ইস্ট ক্যালকাটার ঐ বস্তিটার পপুলেশন কত কারেক্টলি বলতে পারবেন তো?'

অশোকের কথার মধ্যে সূক্ষ্ম একটা খোঁচা ছিল। সেটা টার্গেটে গিয়ে বিঁধল।

পারমিতা ঈষৎ রুক্ষ স্বরে বললেন, 'নিশ্চয়ই পারব। দশ হাজার দু'জন।'

অশোক বলল, 'গুড। দুজন বাদ দিয়ে দশ হাজারই ধরা যাক।

তাতে হিসেবের সুবিধা হবে।'

পারমিতা একটু অবাক হয়ে বললেন, 'কীসের হিসেব?'

'দশ হাজার তিরিশ লাখের মত পারসেন্ট?'

'সে তো খাতা পেন্সিল নিয়ে অঙ্ক কষে বার করতে হবে।'

'আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। আমিই আপনাকে অঙ্কটা কষে দিচ্ছি। দশ হাজার হচ্ছে তিরিশ লাখের ওয়ান-থ্রি হাণ্ড্রেডথ্ পারসেন্ট। তার মানে আপনার ওয়েলফেয়ার অ্যাক্টিভিটির জন্য কলকাতার বস্তিবাসীদের শতকরা একজনও উপকৃত হচ্ছে না। এই বেনিফিটটা পাচ্ছে তিনশো জনে মাত্র একজন। তার রেজাল্টটা কী দাঁড়াচ্ছে?'

'কী?'

'হ্যাভ নটস বা বস্তিবাসীদের মধ্যে দুটো ক্লাস তৈরি হয়ে যাচ্ছে না?'

'কি রকম?'

'একটা প্রিভিলেজড ক্লাস, আরেকটা আন প্রিভিলেজড। সামান্য কিছু লোক ফুড, এডুকেসন, মেডিক্যাল কেয়ার, টেকনিক্যাল ট্রেনিং—এ সব পাবে। বাদবাকী ভাস্ট পপুলেসন যেমন অন্ধকারে পড়ে ছিল তেমনই পড়ে থাকবে। দুঃখী সাফারিং পীপলের মধ্যে এ রকম ক্লাস তৈরি করা কি ঠিক হচ্ছে?'

মাথার ভেতরে যেন ঝিম ধরে গেল পারমিতার। অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকলেন তিনি। তারপর বললেন, 'কিন্তু তিন মিলিয়ন বস্তিবাসীর প্রত্যেকটা মানুষের ভাগ্য ফেরানো, তাদের আর্থিক দুরবস্থা থেকে তুলে আনা আমার ক্ষমতার বাইরে। এর জন্য বিরাট ফাণ্ড দরকার। সে টাকা পাব কোথায়?'

অশোক চুপ করে রইল।

পারমিতা আবার বললেন, 'যেটুকু আমার সাধ্যের মধ্যে সেটুকুও করব না? দুটো লোককেও যদি বাঁচাতে পারি সেটাও কি খুব ছোট কাজ?'

অশোক বলল, 'ছোট কাজ বলছি না। তবে—'

'তবে কী?'

'এ রকম এলোমেলো ভাবে হবে না। সোস্যাল অ্যাণ্ড ইকনমিক সিস্টেমের মধ্যে টোটাল চেঞ্জ না আনতে পারলে সব মানুষের ভাল করা সম্ভব না।'

পারমিতা শরীরটাকে শিথিল করে সীটে হেলান দিয়ে বসলেন। আস্তে করে বললেন, 'যাক, নিজের থিওরি আর বিশ্বাসে এখনও স্টিক করে আছেন দেখে ভাল লাগছে। ইউ আর ওয়েডেড টু দ্যাট গ্র্যাণ্ড গ্রেট আইডিয়া। একটা রেভোলিউসান-টেভোলিউসান ঘটিয়ে টোটাল চেঞ্জ ঘটিয়ে দিন না।'

অশোক গলায় জোর দিয়ে বলল, 'নিশ্চয়ই ঘটাব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। হিউম্যান ওয়েলফেয়ারের যে ফ্যাশান আপনারা চালু করেছেন তখন কিন্তু তা আর থাকবে না। অবশ্য—'

'অবশ্য কী?'

'সত্যি সত্যিই যখন রেভোলিউসান ঘটবে আপনারা কোথায় থাকবেন, সেটা ভাবতে আমার কষ্ট হচ্ছে। তবে এটুকু বলতে পারি আইভরি টাওয়ারে বসে মানুষের ভাল করছি বলে মহত্ত্ব দেখাবার সুযোগ অন্তত পাবেন না। সে কাজটা করবে স্টেট, গভর্ণমেণ্ট, মানে দেশের সব মানুষ। সোসাইটি ডি ক্লাসড হোক, আমার লক্ষ্য সেটা। আমার মতো মানুষদের ডেস্টিনেসনও সেটাই।'

কণ্ঠস্বরে খানিকটা মজা মিশিয়ে পারমিতা বললেন, 'একটা কিছু ঘটান তো মিস্টার ব্যানার্জি। গোটা সিস্টেমটাই বড় বেশি মনোটোনাস হয়ে গেছে। টোটাল চেঞ্জ নিয়ে আসুন। সেই দিনের জন্য ওয়েট করে থাকব।'

অশোক আর কিছু বলল না।

অশোক জিজ্ঞাসু চোখে অর্গানাইজার ভদ্রলোকটির দিকে তাকাল। অর্থাৎ এখন তাকে কী করতে হবে, সেটাই জানতে চাইছে।

অর্গানাইজার ভদ্রলোকটি সসম্ভ্রমে জানালেন, এবার অশোককে রুপোর কাঁচি দিয়ে ফিতেটা কাটতে হবে। তা হলেই পুষ্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়।

কাঁচি তুলে ফিতেটা কেটে ফেলল অশোক। আরেক বার উচ্ছ্বসিত হাততালির শব্দ হল। তারপর অশোকের সঙ্গে সঙ্গে সবাই ফুলের অরণ্যে ঢুকে পড়ল।

খানিকক্ষণ ফুল-টুল দেখে অশোক অর্গানাইজারদের জানালো, 'এবার আমাকে যেতে হবে। লেট আস পার্ট টু-ডে।'

উদ্যোক্তারা সমস্বরে জানালো, 'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার ফর ইওর টেকিং সো মাচ পেইন ইন কামিং হীয়ার।'

'নো পেইন। ইটস রীয়ালি এ প্লেজার' -বলেই চমকে উঠল অশোক। এ রকম সুন্দর মাপা মেকানিক্যাল কথা আগে আর কখনও সে বলেছে কিনা মনে করতে পারল না। অশোক সৈনিক যুবক, আপাত চোখে তাকে রুক্ষ কর্কশ এবং অমার্জিত মনে হতে পারে। কিছুক্ষণ আগেও পারমিতাকে বুঝিয়ে দিয়েছে নিজের ব্যাকগ্রাউণ্ড এবং ক্লাস-ক্যারেক্টার সে ভোলেনি। কিন্তু এই মুহূর্তে ফ্লাওয়ার শো-র উদ্যোক্তাদের কাছে এমন সাজানো কথা বলল কী করে? তবে পারমিতা আর সোমদেব চ্যাটার্জির কাছে যতই নিজের ক্লাস-ক্যারেক্টার নিয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করুক, আসলে ভেতরে ভেতরে সে কি বদলে যাচ্ছে? পরমুহূর্তেই তার মনে হল, সবাইকে সব সময় পিনের খোঁচা মেরে চোয়াড়ে ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বললেই কি শ্রেণীচরিত্র জাহির করা হয়? কিছু লোকের সঙ্গে একটু ভদ্রতা করলে দোষ কী?

উদ্যোক্তারা ফের বলল, 'উই আর গ্রেটফুল টু ইউ স্যার। উই উড নেভার ফরগেট দিস ডে।'

'থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ।' অল্প হেসে অশোক কার পার্কিং জোনের

দিকে এগিয়ে চলল। উদ্যোক্তারাও সঙ্গে সঙ্গে চলল। লীনা এবং রাহেজা তো আছেনই।

গাড়িগুলোর কাছাকাছি আসতেই লীনা অশোককে বলল, 'এবার তুমি আমার গাড়িতে যাবে।'

রাহেজা ব্যস্তভাবে বলে উঠলেন, 'কিন্তু স্যারকে সাড়ে তিনটেয় আরেকটা ফাংসানে প্রিসাইড করতে হবে। তারপরও আছে আরো তিনটে অনুষ্ঠান। রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত একেবারে প্যাকড প্রোগ্রাম।' অর্থাৎ চন্দ্রকান্ত রাহেজা লীনাকে বুঝিয়ে দিলেন সাড়ে আটটা পর্যন্ত কোন ভাবেই অশোককে পাওয়া যাবে না।

লীনা এক সেকেণ্ডও না ভেবে জিজ্ঞেস করল, 'সাড়ে তিনটেয় অশোককে কোথায় প্রিসাইড করতে হবে?'

'বালিগঞ্জে—সানি পার্কে'

'ঠিক আছে, আপনার গাড়ি নিয়ে আগে আগে চলুন। অশোক আর আমি আপনাকে ফলো করে আসছি।'

'আচ্ছা।'

লীনা তার টু-সীটারে উঠে স্টীয়ারিং ধরে বসল। অশোক বাঁ দিকের দরজা খুলে লীনার পাশে বসতে বসতে মজাদার একটা ভঙ্গি করে বলল, 'স্ট্রেঞ্জ!'

গাড়িতে স্টার্ট দিতে দিতে লীনা বলল, 'মানে?'

'বেলেঘাটার বস্তি থেকে ইণ্ডিয়ার এক টপমোস্ট ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের স্ত্রীর সঙ্গে আলিপুরে এসেছি। এখন আরেক টপমোস্ট ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের মেয়ের গাড়িতে সানি পার্কে চলেছি। এত সৌভাগ্যে আমার একটা স্ট্রোক হয়ে যাওয়া উচিত।'

'নো জোক—' বলে গাড়িটাকে হর্টিকালচার গার্ডেনের বাইরে নিয়ে এলো লীনা।

একটু পর দেখা গেল, আগে আগে মন্ত্রী বা গভর্ণরদের পাইলট কারের মতো রাহেজার লিমুজিন রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে চলেছে।

অশোক অন্যমনস্কর মতো জানালার বাইরে তাকিয়ে আছে।

শীতের দিনে আলিপুরের এই পশ এলাকাটা বেশ নিরিবিলি। বাঁদিকে মিলিটারি হসপিটালের বিশাল কমপ্লেক্স, কিছু কিছু হাইরাইজ বিল্ডিং, তেলের মতো মসৃণ রাস্তা, ঘন সবুজ গাছপালা, জু-গার্ডেনের লম্বা কম্পাউণ্ড ওয়াল, নতুন অ্যাকুয়েরিয়াম—এই দৃশ্যাবলীর কিছুই যেন দেখতে পাচ্ছিল না অশোক। আলতো ভাবে সব কিছুই তার চোখকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ একটা কথা অশোকের মাথায় প্রবল ধাক্কা দেয়। দুর্দান্ত সব তরুণীর মেলায় দাঁড়িয়ে পুষ্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন, রুপোর কাঁচি দিয়ে ফিতে কাটা, ভাল ভাল জমকালো কথা সাজিয়ে বক্তৃতা দেওয়া, মেকানিক্যাল ভদ্রতা, যান্ত্রিক হাসি, ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের স্ত্রী এবং মেয়েদের গাড়িতে চড়ে তাদের আশ্চর্য সুন্দর শরীরের ছোঁয়া আর গন্ধ নিতে নিতে ক্যালকাটা মেট্রোপলিসের আগাপাশতলা চষে বেড়ানো—এ সবের জন্যই কি সে সোমদেব চ্যাটার্জির ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এম্পায়ারে এসেছিল?

হঠাৎ লীনা ডাকল, 'অশোক—'

ঘাড় ফিরিয়ে সঙ্গিনীর দিকে তাকাল অশোক, 'কিছু বলছ?'

'হ্যাঁ।'

অশোক অপেক্ষা করতে লাগল। লীনা বলল, 'পারমিতা আন্টিকে তুমি কিন্তু খুব হার্ট করে কথা বলছিলে—'

অশোক বলল, 'একটুও না। যা সত্যি আমি তাই বলেছি।' একটু থেমে কী ভেবে ফের বলল, 'তা ছাড়া কাউকে প্লীজ করে কথা বলার ট্রেনিং আমি কখনও নিই নি। ফ্ল্যাটারি করার মেকানিজম্‌ও আমার জানা নেই।'

'তবু ওঁরা তোমার জন্যে এত করেছেন। ইউ শুড বী গ্রেটফুল টু দেম।'

অশোক ক্ষেপে উঠল, 'গ্র্যাটিচুডের কোন প্রশ্নই ওঠে না। পার্সোনাল কোন বেনিফিটের জন্য আমি এখানে আসিনি। ওঁরা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্ল্ডে আমাকে নিয়ে একটা এক্সপেরিমেণ্ট করতে চান।

আমিও অন্যভাবে এই অপরচুনিটিকে কাজে লাগিয়ে আরেক রকম এক্সপেরিমেণ্ট করতে চাই। এর ভেতর কৃতজ্ঞতা-ফ্‌তজ্ঞতার কথা আসে কী করে?'

লীনা চুপ করে রইল।

অশোক ফের বলতে থাকে, 'খুব তো পারমিতা আন্টির জন্য সিমপ্যাথি দেখাচ্ছ। কিন্তু যখন ওঁকে স্ল্যাশিং দিচ্ছিলাম তখন তো খুবই এনজয় করছিলে!'

'এনজয় করার কথাই ওঠে না। তুমি আমাকেও স্পেয়ার করনি।' বলে থামল লীনা। খানিকক্ষণ কী ভেবে ফের শুরু করল, 'সোসাল রেভোলিউসান ঘটাতে কিছুদিনের জন্য তুমি ইণ্ডিয়ার একজন ফোরমোস্ট ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হয়েছ। আসলে নিজেকে তুমি অর্থনৈতিক দিক থেকে উইকেস্ট সেকসানের রিপ্রেজেণ্টেটিভ বলে মনে কর, তাই না?'

'মনে করাকরির কিছু নেই। আমি দারিদ্র্যসীমার নীচেকার কোটি কোটি মানুষের প্রতিনিধি।'

'গুড। আচ্ছা একটা কথার উত্তর দাও তো—'

'কী কথা?'

'বস্তিবাসী গরীব ক্লাসের লোক হলেই কি রুড রাফ হতে হবে? মানুষকে কষ্ট দিয়ে বিদ্রূপ করে কথা না বললে কি ক্লাস ক্যারেক্টার বোঝানো যায় না?'

'সারা জীবন তারা এক্সপ্লয়টেড হবে আর এক-আধটা উল্টোপাল্টা কথা বললেই দোষ! যারা দুটো স্কোয়ার মীল যোগাড় করতে পারে না তাদের কাছে ভদ্রতা, ডেকোরাম—এ সব এক্সপেক্ট করাই অন্যায়। সে যাক, তুমি নিশ্চয়ই এ সব কথা বলার জন্য আমার সঙ্গে আসোনি।'

'না। আমার অন্য কথা আছে।'

'বলে ফেল।'

তক্ষুনি কিছু বলল না লীনা। বেশ খানিকক্ষণ পর বলল,

বেলেঘাটার স্লামে পারমিতা আন্টির নানারকম অ্যাক্টিভিটি দেখে আমি নার্ভাস হয়ে পড়েছি।'

অশোক জিজ্ঞাসা করল, 'কেন ?'

'নিউজ পেপারের লোকেরা আর টি-ভি'ওলারা বাইরে গিয়ে ওঁর কাজের দারুণ পাবলিসিটি দেবে। তার নীট রেজাল্ট কী হবে জানো? জেনেভায় আণ্ডার-ডেভলাপড কান্ট্রির স্লাম নিয়ে যে কনফারেন্স বসবে আমি সেখানে ডেফিনিটলি ইণ্ডিয়াকে রিপ্রেজেণ্ট করতে পারব না। আন্টিই ডেলিগেট হয়ে চলে যাবে।' বলতে বলতে লীনার চোখ-মুখ এবং গলার স্বরে হতাশা ফুটে উঠতে লাগল।

মাথার ভেতর বিস্ফোরণ ঘটে গেল যেন অশোকের। তার সঙ্গে আসার উদ্দেশ্যটা এতক্ষণে টের পাওয়া যাচ্ছে। ক্ষেপে উঠতে গিয়েও সে কিন্তু হেসে ফেলল। রগড়ের গলায় বলল, 'যাক, এতক্ষণে ঝোলা থেকে বেড়ালটা বেরুল। পভার্টি লাইনের নীচেকার লোকদের নিয়ে তোমার আর তোমার আন্টির রাইভ্যালরি দেখে দারুণ মজা লাগছে। তবে একটা ব্যাপারে তোমাকে অ্যাস্যুয়োরেন্স দিতে পারি।'

'কী ব্যাপারে ?'

'আমাদের মত বস্তিবাসীরা তাদের ওপর রিপ্রেজেন্টেটিভ সিলেক্ট করার সুযোগ পায় না। যারা সিলেক্ট করে তাদের ওপর ইণ্ডাস্ট্রিয়াল টাইকুন সোমদেব চ্যাটার্জির যেমন ইনফ্লুয়েন্স রয়েছে তেমনি তোমার বাবা স্যার হরকিষণদাস দেশাইরও আছে। কাজেই অন্য কোন কারণে আমাদের মত ওয়ার্স্ট পশুদের প্রতিনিধি হয়ে তুমি যদি জেনেভায় না-ও যেতে পারো, ফ্রাঙ্কফুর্ট কি সানফ্রান্সিসকো কি কোপেন-হেগেনে ঠিকই চলে যাবে।' একদমে কথাগুলো বলে কিছুক্ষণ থামে অশোক। জোরে জোরে শ্বাস টেনে ফুসফুস বোঝাই করে আবার আরম্ভ করে, 'আমাদের মতো স্লাম-ডোয়েলারদের জন্য ওয়ার্ল্ডের অ্যাফ্লুয়েন্স সোসাইটির তো ঘুম নেই। আমাদের দুঃখ-কষ্ট ঘোচাবার জন্য হাজার হাজার বছর ধরে দামী মদ আর বেস্ট খাদ্য স্টমাকে পুরে

কনফারেন্সের পর কনফারেন্স করে যাবে। তোমার কোন চিন্তা নেই।

লীনা উত্তর দিল না। দ্রুত এক পলক অশোককে দেখে সোজা উইণ্ডস্ক্রীনের বাইরে তাকল।

পাঁচ

দেখতে দেখতে আরো একটা মাস কেটে গেল। একটা দিন যেন আরেকটা দিনের হুবহু কার্বন কপি। একই নিয়মে একই রকম প্যাকড প্রোগ্রাম দিয়ে সকাল থেকে মাঝ রাত পর্যন্ত প্রতিটি দিন ঠাসা। এখন প্রতি মুহূর্তে অশোকের মনে হয়, একটা মারাত্মক মেকানিক্যাল প্রসেসের মধ্যে সে ঢুকে পড়েছে। এর ভেতর থেকে কোন দিনই সে বোধ হয় আর বেরুতে পারবে না। রোজ রোজ ভোরে ওঠা, বেড-টি খাওয়া গাদা-গাদা খবরের কাগজ পড়া, শেয়ার মার্কেটের উত্থান পতন মার্ক করা, গভর্ণমেণ্টের ফিসক্যাল পলিসি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা, তারপর বিকিনি টাইপের একটা জাঙিয়া পরে চীনা যুবতীর ম্যাসাজ নেওয়া, ম্যাসাজের পর স্নান, ব্রেকফাস্ট এবং কাঁটায় কাঁটায় দশটায় প্রাইভেট সেক্রেটারি চন্দ্রকান্ত রাহেজার সঙ্গে অফিসে যাওয়া। অফিসে কি একটা কাজ? রোজই কম করে এক ডজন করে কনফারেন্স, মাঝে মাঝে হাই-পাওয়ার কমিটির সঙ্গে সিক্রেট মিটিংয়ে বসে তাদের ইণ্ডাস্ট্রিয়াল হাউসের নানা গুরুত্বপূর্ণ পলিসি স্থির করা, ফাঁকে ফাঁকে চেম্বার অফ কমার্সে গিয়ে দামী দামী ভাষণ দান, কেন্দ্র এবং রাজ্যের নানা মিনিস্টার এবং সেক্রেটারির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা, ফরেন কোলাবরেসনের ব্যাপারে নানা দূতাবাসের ভি-আই-পি'দের সঙ্গে মিটিং—এ সব তো আছেই। তা ছাড়া প্রতিদিনই গণ্ডা গণ্ডা সোসাল ফাংসান রয়েছে। সে সব জায়গায় সভাপতি বা প্রধান অতিথি বা উদ্বোধকের রোল প্লে করতে হয়। সবার ওপরে রয়েছে ক্লাব। প্রতিটি দিন অশোকের শরীর থেকে অনেকটা করে এনার্জি

বার করে নিচ্ছে। সে বুঝতে পারে না, ভেতরে তার জীবনীশক্তি আর উদ্দীপনা ক্রমশ ক্ষয়ে যাচ্ছে কিনা।

এই এক মাসে অভাবনীয় বা চমকপ্রদ কিছুই ঘটেনি। শুধু সেই বিদেশী জার্ণালিস্টটি আর টি-ভি'ওলারা অশোকের বাড়িতে এসে এক-দিন ডিনার খেয়েছেন এবং একটা এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ নিয়েছেন। 'এ রেবেল অ্যামং দা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল টাইকুন্‌স'—এই নামে নাকি তার ইন্টারভিউটা কাগজে বেরুবে আর টি-ভিতে দেখানো হবে। এ ছাড়া টালিগঞ্জে তার সেই পুরনো নোংরা ঘিঞ্জি পাড়া থেকে রণেশ পল্টা ভণ্টে ললিত বিষ্টু—এমনি পঞ্চাশটা ছেলে চাকরির জন্য অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে গেছে। এবং কাজে বসিয়ে দেবার জন্য টেলিফোনে রীতিমত তাগাদা দিয়ে যাচ্ছে। ওদের ধারণা, অশোক ইচ্ছা করলেই যখন খুশি তাদের চাকরি দিতে পারে। এই ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এম্পায়ারে আসার আগে অশোকেরও সেই রকমই ধারণা ছিল। যাই হোক, সে রণেশদের জানিয়েছে নানা ব্যাপারে তার হাত-পা বাঁধা, তবে ওদের চাকরির জন্য রেগুলার চেষ্টা করে যাচ্ছে। তার কথা রণেশরা বিশ্বাস করেছে বলে মনে হয় না।

এই এক মাসের মধ্যে টালিগঞ্জে একবারও যাওয়া হয় নি। তিরিশ দিনে সাতশো কুড়ি ঘণ্টার মধ্যে এমন একটু সময় অশোক বার করতে পারে নি যাতে কিছুক্ষণ রেখাদের কাছে কাটিয়ে আসতে পারে। সে জানে, রেখারা মালতীকাকিমারা তাকে ভুল বুঝতে শুরু করেছে। সে টের পায় টালিগঞ্জের সঙ্গে তার দূরত্ব ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। এখনই এ ব্যাপারে কিছু একটা করা দরকার। কিন্তু এই ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্ল্ডে ঢোকার পর সময়ই যে পাওয়া যাচ্ছে না।

আজ অফিসে পর পর আটটা কনফারেন্স ছিল। তারপর চেম্বার অফ কমার্সে একটা মিটিং। মিটিংয়ের পর একটা ফাইভ-স্টার হোটেলে এয়ার পলিউসান এবং তার ফলে নানা রকম সমস্যা সম্পর্কে একটা সেমিনার উদ্বোধন করতে হল অশোককে। এ সব সারতে

সারতে আটটা বেজে গেল।

সেমিনার থেকে সোজা অশোকদের ক্লাবে চলে যাবার কথা। সেখানে আজ একটা ডিনার পার্টি আছে।

সেমিনারের পর হোটেল থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে অশোক রাহেজাকে বলল, 'মিস্টার রাহেজা, আমি আজ ডিনারে যাচ্ছি না।'

চন্দ্রকান্ত রাহেজা সাপের কামড় খাওয়ার মত চমকে উঠলেন, 'কিন্তু কথা দেওয়া আছে—'

'থাক।'

'সবাই আপনাকে খুব এক্সপেক্ট করবে স্যার।'

কিছুটা রুক্ষ গলায় অশোক এবার বলল, 'এক্সপেক্ট করুক আর যা-ই করুক আমি আজ যাব না, কিছুতেই না।'

'না গেলে স্যার খুব খারাপ দেখাবে।'

'দেখাক।'

বিব্রতভাবে রাহেজা বোঝাতে চেষ্টা করলেন, 'কিন্তু স্যার, ব্যাপারটা দয়া করে একটু ভেবে দেখুন—'

অশোক প্রায় চিৎকারই করে উঠল, 'নো নো, আই অ্যাম নট গোয়িং টু ডিনার টু-ডে। রোজ আপনাদের সব কথা শুনি। ভোরে বেড-টি, সাতটায় ম্যাসাজ, সাড়ে সাতটায় স্নান, সাড়ে আটটায় ব্রেকফাস্ট, দশটায় অফিস, তারপর কনফারেন্সের পর কনফারেন্স, সোসাল ফাংসান, ডিনার পার্টি, লাঞ্চ পার্টি—আমি টোটালি ফেড-আপ মিস্টার রাহেজা।'

রাহেজা কী বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে হাত তুলে থামিয়ে দিল অশোক। আগের মতই উত্তেজিত ভঙ্গিতে বলে যেতে লাগল, 'আমার এতটুকু স্বাধীনতা নেই। আপনারা আমাকে দিয়ে যে ভাবে পাপেট ড্যান্স করিয়ে যাচ্ছেন সেই ভাবেই নেচে চলেছি। কিন্তু এ ভাবে অন্যের হাতের তালুতে নাচবার জন্য আমি এই ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এম্পায়ারে আসি নি।'

সবিনয়ে এবং সসম্ভ্রমে রাহেজা বললেন, 'স্যার, সব ব্যাপারেরই

একটা করে সিস্টেম থাকে। এটা এই ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্ল্ডের সিস্টেম—'

'আমি মানছি না, মানছি না, মানছি না। আপনারা আমাকে একটা এয়ার-টাইট কম্পার্টমেন্টে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। আমার দম একেবারে বন্ধ হয়ে আসছে। আপনাদের এই সিস্টেমের বিরুদ্ধে আমি রিভোল্ট করছি।'

'আপনি ডিনারে না গেলে ওঁদের জানিয়ে দিতে হবে তো?'

'জানিয়ে দিন।'

'না যাবার কারণ কী বলব?'

'এনি ড্যাম থিং মিস্টার রাহেজা। ইউ আর ইন্টেলিজেন্ট পার্সন। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্ল্ডের ঘুঘুদের চরিয়ে চরিয়ে চুল পাকিয়ে ফেলেছেন। বলে দিন না—আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি কিংবা বেহেড মাতাল হয়ে ফ্ল্যাট হয়ে আছি কিংবা কাউকে কিছু না জানিয়ে উধাও হয়ে গেছি। এনি ড্যাম এক্সকিউজ।'

এক মুহূর্ত কী ভাবলেন রাহেজা। তারপর বললেন, 'ঠিক আছে স্যার, ওদের কিছু একটা বুঝিয়ে বলব।'

অশোক বলল, 'দ্যাট্স লাইক এ ফাইন প্রাইভেট সেক্রেটারি। থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ।'

'স্যার—' বলেই চুপ করে গেলেন রাহেজা।

অশোক তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে টের পেল, ভদ্রলোকের আরো কিছু বক্তব্য আছে। জিজ্ঞেস করল, 'কিছু বলবেন?'

'হ্যাঁ স্যার। আপনার শরীরটা কি খারাপ হয়েছে? তা হলে একটা মেডিক্যাল চেক-আপ করিয়ে নিলে ভাল হয়।'

অশোক বলল, 'দরকার নেই। আমার শরীর নরম্যালের চাইতে অনেক ভাল আছে। কোয়াইট হেল অ্যাণ্ড হার্টি। আজকের রাতটার মতো আপনাদের এরীয়ার বাইরে যেতে পারলে আরো ভাল থাকব।'

'আপনি কি কোথাও যেতে চান স্যার?'

অশোক মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল, সব কিছু ভেঙেচুরে আজ টালিগঞ্জে যাবেই যাবে। কিন্তু সে কথা রাহেজাকে বলল না। সে শুধু জানালো, 'আমার ইচ্ছামতো আজ একটু ঘুরব। আপনি গাড়ি নিয়ে ফিরে যান।'

রাহেজা প্রায় আঁতকেই উঠলেন, 'আপনি তা হলে কী ভাবে ঘুরবেন স্যার?'

অশোক হাসল। বলল, 'মিস্টার রাহেজা, আপনি আমার ব্যাকগ্রাউণ্ড জানেন। টালিগঞ্জের যে স্লাম থেকে এসেছি, তা-ও নিজের চোখে দেখেছেন। আপনাদের এই ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এম্পায়ারে ঢুকবার আগে আমার ক'টা লিমুজিন ছিল? মিস্টার রাহেজা, কলকাতার রাস্তায় দেড় লাখ দু' লাখ টাকা দামের সরকারী গাড়িগুলো দেখেছেন?'

রাহেজা বললেন, 'স্টেট-ট্রান্সপোর্টের বাসগুলোর কথা বলছেন স্যার।'

'রাইট।'

'ঐ ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্টে করেই ফ্রীলি কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করতে চাই।'

এবার সত্যি সত্যিই শিউরে উঠলেন রাহেজা, 'বাসে-ট্রামে কি মানুষ উঠতে পারে? যা গাদাগাদি ক্রাউড।'

'এতকাল তো তাতেই উঠেছি। ওতে যারা চড়ে আমি তো তাদেরই রিপ্রেজেণ্টেটিভ। আপনারা লিমুজিন চড়িয়ে আমার হ্যাবিট এখনও নিশ্চয়ই এমন খারাপ করতে পারেন নি যাতে বাসে ওঠা যায় না। আচ্ছা চলি—'

কথা বলতে বলতে ওরা হোটেলের বাইরে চলে এসেছিল। রাহেজার হঠাৎ কী মনে পড়ে যেতে বললেন, 'স্যার যদি অনুমতি ছান একটা কথা বলতে চাই—'

অশোক বলল, 'অনুমতি আবার কী, আপনার যা ইচ্ছা বলতে পারেন—'

'স্যার, আপনি ছাভ-নটদের প্রতিনিধি হলেও সারকাম্‌সট্যান্সেস আপনাকে দেশের একজন সেরা ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট বানিয়ে ফেলেছে। একজন মানুষ কোন কারণে লাইম লাইটে এসে গেলে তাঁর লাইফের রিস্ক অনেক বেড়ে যায়। বিশেষ করে তাঁর হাতে যদি পাওয়ার বা অর্থ থাকে।'

অশোক কোন উত্তর না দিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইল।

রাহেজা বললেন, 'আপনি এই ইণ্ডাস্ট্রিয়াল হাউসে আসার পর খবরের কাগজে নানা সময়ে আপনার ছবি বেরিয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ এখন আপনাকে চেনে।'

রাহেজা যা বললেন তার সবটুকুই সত্যি। অশোক বলল, 'হয়তো তাই।'

'মিস্টার সোমদেব চ্যাটার্জি আপনার লাইফের সবটুকু দায়-দায়িত্ব আমাকে দিয়েছেন। আমি স্যার দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো আপনাকে বাসে যেতে দিতে পারি না।'

'কী করতে চান আপনি?'

'আপনি যেখানে যাবেন সেখানে যদি পৌঁছে দিই, তারপর আপনার কাজ হয়ে গেলে আবার নিয়ে আসি?'

'আমি আপনাদের কাছে কিছুক্ষণের জন্য ফুল ফ্রীডম চাইছি মিস্টার রাহেজা।' অশোক চিৎকার করে উঠল।

রাহেজা উত্তর দিলেন না।

অশোক ফের চেঁচাল, 'আমি নরকে গেলেও কি আপনি জোঁকের মতো আমার গায়ে আটকে থাকবেন? আমি কি কখনও একটু মুক্তি পাব না?'

'আমার অবস্থা আর দায়িত্বের কথাটা একটু বিবেচনা করুন স্যার।'

কর্কশ গলায় অশোক বলল, 'বিবেচনা করার কিছু নেই। আমি আপনাকে প্রাইভেট সেক্রেটারির রোলেই দেখতে চাই, গোয়েন্দার ভূমিকায় নয়। কাইণ্ডলি আপনি আমার সঙ্গে আসবেন না।'

রাহেজা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'ঠিক আছে স্যার, আপনি যখন চাইছেন না তখন যাব না। তবে আমার একটা আর্জি আছে।'

'বলুন—'

'বাসে না গিয়ে গাড়িতে যান। শোফারকে কাইণ্ডলি চালিয়ে নিয়ে যেতে দিন।'

'আমি গাড়ি নিয়ে গেলে আপনি ফিরবেন কী করে?'

'আমার জন্যে ভাববেন না স্যার। একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে যাব। না পাওয়া গেলে বাড়িতে ফোন করে অন্য গাড়ি আনিয়ে নেব।'

'আচ্ছা—'

'তা হলে স্যার, দয়া করে আপনি এখানে একটু অপেক্ষা করুন। পার্কিং জোন থেকে আমি গাড়িটা নিয়ে আসছি।'

হোটেলের উল্টোদিকে, রাস্তার ঠিক ওপারে কার পার্কিং জোন। রাস্তা পেরিয়ে ওপার থেকে শোফারসুদ্ধ লিমুজিনটা নিয়ে এলেন রাহেজা। দ্রুত নেমে দরজা খুলে দিয়ে বললেন, 'উঠুন স্যার—'

অশোক আর দাঁড়াল না। উঠে ব্যাকসীটে বসতেই দরজা বন্ধ করে দিলেন রাহেজা। বললেন, 'গুড নাইট স্যার—'

'গুড নাইট—' বলেই অশোক শোফারকে হুকুম দিল, 'সিধা চল।' অনেকটা যাবার পর ফের বলল, 'টালিগঞ্জ—'

'জী সাব—' শোফার সামনের দিকে নজর রেখে উত্তর দিল।

অশোকের মনে আছে, এই শোফারটাই ড্রাইভ করে প্রথম দিন টালিগঞ্জে তাদের গলিতে রাহেজাকে নিয়ে গিয়েছিল। সে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের কোম্পানিতে আসার আগে টালিগঞ্জে আমি যে গলিটায় থাকতাম সেটা চেনো?'

'জী সাব।'

'আমাকে সেখানে নিয়ে চল।'

'জী সাব।'

চৌরঙ্গী ধরে খানিকটা যাবার পর হঠাৎ কী মনে পড়তে অশোক

দারুণ ব্যস্ত ভাবে বলল, 'শোফার, টালিগঞ্জ যাবার আগে একবার পার্ক স্ট্রীটে যাও।'

'জী—' শোফার গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে পার্ক স্ট্রীটে চলে এলো।

এখানে একটা এয়ার-কণ্ডিশাণ্ড ডিপার্টমেন্টাল স্টোর থেকে আন্দাজে আন্দাজে মাপ বলে হরকাকার তিন ছেলেমেয়ে নান্টু ঝিন্টু আর সোনার জন্য দামী শার্ট, ট্রাউজার্স আর মিডি ফ্রক কিনল। হরকাকার জন্য নিল ফিনফিনে ধুতি আর শার্টের কাপড়, মালতী কাকিমার জন্য গরদের শাড়ি, রেখাদের তিন বোনের জন্য শিফন আর ওদের মায়ের জন্য মুগার কাজ-করা তাঁতের শাড়ি।

কেনাকাটা করতে আধঘণ্টার মত লাগল। তারপর মিনিট পঁচিশেকও কাটল না, অশোকের ইমপোর্টেড লিমুজিন কলকাতার ভাঙাচোরা রাস্তার ওপর দিয়ে তেলের মতো গড়িয়ে গড়িয়ে সোজা টালিগঞ্জে তার আজন্মের চেনা গলিটায় এসে থামল।

শোফার এক সেকেণ্ডও দেরি করল না। দ্রুত ইঞ্জিন বন্ধ করে নেমে পড়ল। তারপর দৌড়ে এসে পিছন দিকের দরজা খুলে দিতেই জামা-কাপড়ের প্যাকেট নিয়ে অশোক বাইরে বেরিয়ে এলো।

এখন রাত ন'টার বেশি হবে না। এ দিকটায় আজ লোডশেডিং না থাকলেও বেশ অন্ধকার। তার কারণ রাস্তায় আলো নেই। বাৎসরিক শ্রাদ্ধের মতো কর্পোরেসন ফী বছরই একবার করে এখানকার ল্যাম্প পোস্টগুলোতে বাল্ব ঝুলিয়ে দিয়ে যায়। দু-চারদিন গলিটা আলোয় আলোয় ঝলমল করতে থাকে। তারপর কারা যেন বাল্বগুলো খুলে নিয়ে মোড়ের মাথায় গণেশ হালদারের যে ইলেকট্রিকের দোকানটা রয়েছে সেখানে বেচে দেয়। গণেশের সঙ্গে টালিগঞ্জের এই অঞ্চলের সবগুলো বাল্বচোরের একটা গোপন কনট্রাক্ট আছে। ফিফটি পারসেন্ট চোরাই বাল্ব কিনে থাকে সে। যাই হোক, যত দিন না কর্পোরেসনে আবার একটা বার্ষিক শ্রাদ্ধের দিন আসছে, এই গলিটায় লোডশেডিং চলতেই থাকে।

রাস্তায় নেমে নিজের অজান্তেই কোণাকুণি ডানদিকে একবার

তাকাল অশোক। ওখানে ললিতের চায়ের দোকান। এই রাত ন'টাতেও দোকানের সামনে সেই পার্মানেণ্ট আড্ডাটা চোখে পড়ল। দোকানটা এ গলির আন-এমপ্লয়েড যুবকদের রেঁদেভু। সকাল ছ'টা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত যতক্ষণ টী-স্টলটা খোলা আছে, ভিড়টা অনড় হয়ে থাকে। গোটা গলিটা অন্ধকার হলেও দোকানের কাছাকাছি খানিকটা জায়গায় আলো রয়েছে। ললিত হ্যাজাকটা সামনের দিকে ঝুলিয়ে রেখেছে, এটা তারই আলো।

ঘাড় ফিরিয়ে অশোক তাদের ব্যারাকবাড়ির দিকে পা বাড়াতে যাবে, আচমকা চায়ের দোকানের দিক থেকে কারা যেন একসঙ্গে চাপা গলায় বলে উঠল, 'শিল্পপতি এসেছে রে!' বলার মধ্যে কোথায় যেন একটা বিদ্রূপ রয়েছে।

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল অশোক। আর তখনই শুনতে পেল 'অশোকদা—'

এতটা দূর থেকে আবছা আলোয় চেনা গেল না। তবে গলা শুনে মনে হল রণেশ। অশোক বলল, 'রণা নাকি রে?'

'হ্যাঁ।' বলেই উঠে দাঁড়াল রণেশ। তার দেখাদেখি আরো কয়েক জন। সবাইকে সিলুয়েট ফিগারের মতো দেখালেও এখন চিনতে অসুবিধে হচ্ছে না। ওরা বল্টু, পল্টা, জগা আর নিকু।

বল্টু বলল, 'তুমি এসেছ, ভালই হয়েছে। ভাবছিলাম কাল তোমার অফিসে যাব।'

পল্টা বলল, 'তোমার সঙ্গে ফেস-টু-ফেস কথা আছে অশোকদা। একটু টাইম দিতে হবে।'

জগা পল্টার দিকে ফিরে খিঁচিয়ে উঠল, 'টাইম দিতে হবে কী! আমাদের এখানে অশোকদা এসেছে, আমাদের কথা না শুনলে যেতে দেব নাকি?'

জগার কথাগুলোর মধ্যে শাসানির মতো একটা ব্যাপার রয়েছে। কানে খট করে লাগল অশোকের। ক্ষেপে উঠতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল সে। বলল, 'সব শুনব। তার আগে কাকা-কাকিমার

তাই নিয়ে ইউনিয়ন আপিসে মীটিং থাকে।'

অশোক চমকে উঠল, 'কী গোলমাল হয়েছে? কিসের গোলমাল?'

'আমাকে তো সব বলে না। তবে তোর কাকার ইউনিয়নের বন্ধুরা আসে। ওদের কথাবার্তা থেকে যেটুকু বুঝেছি তাতে মনে হয়, কোম্পানি নাকি কী সব অন্যায় করছে। এতে মজুরদের নাকি ভীষণ ক্ষতি হয়ে যাবে।'

অশোক শিরদাঁড়া টান টান করে বসল। জিজ্ঞেস করল, 'কী অন্যায় করছে কোম্পানি?'

'অত-শত বলতে পারব না বাপু।'

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে অশোক বলল, 'কোম্পানি এমন কিছু তো করছে না যাতে ওয়ার্কারদের ক্ষতি হয়। করলে আমি অন্তত জানতে পারতাম।'

'আরে তাই তো—' মালতী খুব ব্যস্তভাবে এবার বলে ওঠে, 'কিছু হলে তোরই তো আগে জানবার কথা। তুই হলি তোর কাকাদের কোম্পানির মালিক।'

অশোক কেমন করে বোঝায়, সে মালিক-টালিক কিছু না। সে ঐ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ওয়াল্ডে গেছে সোসাল প্যাটার্ন বদলে দেবার জন্য। কিন্তু এত কথা মালতী কাকিমার মত সোজা সরল টাইপের ভাল মানুষের মাথায় ঢুকবে না। অবশ্য তাকে বোঝাবার জন্য এই মুহূর্তে অশোকের খুব একটা উৎসাহ নেই। তার মাথায় অন্য একটা ভাবনা ঘুণপোকার মত শিরা কাটতে লাগল। ওয়ার্কারদের স্বার্থের ক্ষতিকারক কী পলিসি নিয়েছে কোম্পানি আর সে কিছু জানে না! তবে কি তার অজান্তে গোপনে লুকিয়ে চুরিয়ে কিছু করা হচ্ছে? ভাবতেই মাথার ভেতর যেন বিস্ফোরণ ঘটে যায় অশোকের।

মালতী ফের বলে, 'কী হয়েছে রে তোদের কোম্পানিতে?'

অশোক বলল, 'কিছু হয়েছে বলে আমি অন্তত জানি না।'

উদ্বেগের ছায়া সরে গিয়ে মালতীর মুখ-চোখ ঝলমলিয়ে ওঠে।

সে বলে, 'যাক বাবা, বাঁচালি। তোকে না জানিয়ে কোম্পানির অন্য কেউ কি কিছু করতে পারে? তোর কাকাকে কতবার বলেছি, অশোক যখন তোমাদের কোম্পানির কর্তা তখন অন্যায় কিছু ও করতেই দেবে না। ও তো আমার হাতেই মানুষ, ছেলেবেলা থেকে ওকে আমি চিনি। তা তোর কাকা যদি আমার কথা কানে তোলে। তার আর তার সাঙ্গোপাঙ্গোদের মুখে এক কথা, কোম্পানির সঙ্গে লড়াইতে নামতে হবে।'

মালতী কাউকে অবিশ্বাস করতে জানে না। যেই অশোক বলেছে কোম্পানির কোন অন্যায় করার কথা তার জানা নেই, অমনি তা বিশ্বাস করে ফেলেছে সে। অশোকের ওপর তার অগাধ আস্থা। অশোক যে পরের ক্ষতিকর কোন কাজ করতে পারে, এটা সে ভাবতেই পারে না। মালতী যত সহজেই সব কিছু মেনে নিক না, অশোকের মাথায় সেই দুশ্চিন্তাটা অনবরত হাতুড়ির ঘা মারতে থাকে। গোপনে গোপনে, তাকে না জানিয়ে বিলিমোরিয়া আগরওয়াল বা সান্ধুরা কি কিছু করে যাচ্ছেন? হরনাথ না ফেরা পর্যন্ত তার উৎকণ্ঠা কাটছে না। তার মুখ থেকে সব শুনতেই হবে।

এদিকে সোনা, ঝিন্টু আর নান্টুর তিন জোড়া চোখ বার বার জামা-কাপড়ের সুদৃশ্য প্যাকেটগুলোর দিকে চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ সোনা সেগুলো দেখিয়ে বলল, 'এগুলোর ভেতর কী আছে বড়দা?'

এতক্ষণ খেয়াল ছিল না। এবার অশোক স্তূপাকার প্যাকেট-গুলোর ভেতর থেকে তিনটে বার করে তিনজনের হাতে দিতে দিতে বলল, 'খুলে ছাখ —'

চোখের পলকে প্যাকেটগুলোর মুখ খুলে গেল। নান্টু আর ঝিন্টু বার করল ট্রাউজার্স আর শার্ট, সোনা বার করল মিডি। তাদের মুখ খুশিতে চক চক করতে লাগল।

অশোক জিজ্ঞেস করল, 'কী রে, পছন্দ হয়েছে?'

তিনজনেই অনেকটা করে ঘাড় হেলিয়ে দিল।

অশোক আবার বলল, 'আন্দাজে আন্দাজে মাপ বলে কিনেছি।

পরে ছাখ তো ছোট-বড় হল কিনা। ফিট না করলে আবার বদলাতে হবে।'

সোনারা জামা-টামা না পরে গায়ের ওপর ধরে বলল, 'বদলাতে হবে না বড়দা, ঠিক ফিট করে যাবে।'

'তবু একবার পরে ছাখ না।'

প্রাণ ধরে কেউ নতুন পোশাক-টোশাক পরল না, বার বার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে লাগল আর নাকের কাছে এনে কত বার যে গন্ধ নিল তার হিসেব নেই।

অশোক এবার মালতী আর হরনাথের প্যাকেট ছুটো খুলে শাড়ি ধুতি-টুতি বার করে মালতীকে দিতে দিতে বলল, 'এগুলো তোমার আর হরকাকার—'

কাপড়ের ভাঁজ খুলে মালতী বলল, এ কী করেছিস অশোক!'

'কী কাকিমা?'

'ভাইবোনদের জন্যে এনেছিলি, ঠিক আছে। আমাদের জন্যে আবার আনতে গেলি কেন?'

'আনতে ইচ্ছা হল।'

'এ সব যে অনেক দামী জিনিস রে!'

'কত আর দাম।'

'তুই বল্ না—'

অশোক কিছুতেই বলবে না। মালতীও নাছোড়। শেষ পর্যন্ত দামটা বলতেই হল অশোককে। শুনে অনেকক্ষণ চোখের তারা স্থির হয়ে রইল মালতীর। তারপর সে বলল, 'কী পাগল রে তুই। এত খরচ করে কেউ জামা-কাপড় কেনে!'

মালতী কাকিমা ইকনমিক্স জানে না, অঙ্ক জানে না, অ্যাকাউন্টেন্সি জানে না। অশোক যে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এম্পায়ারের টপমোস্ট পার্সন হয়েছে সেখানে প্রতি দশ মিনিটে যে নতুন অ্যাসেট তৈরি হচ্ছে তা দিয়ে হরকাকাদের ফ্যামিলি তো খুব তুচ্ছ ব্যাপার, গোটা টালিগঞ্জের সব মানুষের পাঁচ বছরের বেস্ট পোশাক হয়ে যায়।

অশোক বলল, 'খরচের ব্যাপার নিয়ে তুমি মাথা ঘামিও না তো কাকিমা। আগে বল, আমার পছন্দ কেমন?'

মালতী তবু বলতে লাগল, 'না, ঘামাবে না। এত খরচ করার কোন মানে হয়!'

অশোক উত্তর দিল না। তক্তাপোষে আরো তিন চারটে প্যাকেট রয়েছে। সেগুলো দেখতে দেখতে রেখাদের কথা মনে পড়ে গেল তার। মালতীকে জিজ্ঞেস করল, 'রেখারা কেমন আছে কাকিমা?'

মালতী বলল, 'খুব ভাল নেই। মাঝখানে ওর মায়ের খুব অসুখ করেছিল। দিন কুড়ি ভুগে উঠল। ভুগে ভুগে শরীরে আর কিছু নেই।'

অশোক বলল, 'রেখার মায়ের অসুখের কথা শুনেছিলাম। কিন্তু এত বাড়াবাড়ি হয়েছিল তা তো জানি না।'

'কী করে জানবি? তুই তো আর আসিস না এখানে, খবর-টবরও রাখিস না।'

খুব সহজ ভাবেই কথাগুলো বলেছে মালতী কিন্তু সেগুলো চাবুকের মত মুখের ওপর এসে লাগল অশোকের। চোখ নামিয়ে কিছুক্ষণ বসে থালক সে। তারপর নীচু গলায় আস্তে করে বলল, 'তোমাকে তো বলেছিই কাকিমা, সব সময় এত ঝামেলায় থাকি যে এখানে আসতে পারি না।'

মালতী অশোকের কথা যেন শুনতেই পায়নি। সে বলে যেতে লাগল, 'রেখার মা অসুখ থেকে উঠতে না উঠতেই ওরা আরেকটা বিপদে পড়েছে।'

'কী বিপদ?' অশোক প্রায় চমকেই উঠল।

'রেখার বাবা অফিসের পর বড়বাজারে মারোয়াড়ীর গদিতে খাতা লিখত না?

'হ্যাঁ।'

'সেই কাজটা গেছে।'

'কী বলছ!'

ম্লান হাসল মালতী। বলল, 'ঠিকই বলছি রে, বিপদ যখন আসে

খাওয়া ভাল পরার জন্যেই তো তোমাদেয় এত মুভমেণ্ট, এত বিক্ষোভ।'

'তুই ঠিকই বলেছিস অশোক। নিজের হাতে করে এগুলো এনেছিস, আমাদের মাথা পেতে নেওয়া উচিত কিন্তু নেওয়া সম্ভব না রে—' বলতে বলতে অশোকের কাঁধে আলতো করে একটা হাত রাখল হরনাথ। একটু আগে যে মানুষ উত্তেজিত, কর্কশ, রুক্ষ এবং কখনও ক্ষিপ্ত, এখন সে একেবারেই বদলে গেছে।

এই মুহূর্তে হরনাথ বড় স্নিগ্ধ, স্নেহপ্রবণ, সহৃদয়।

আজন্ম এই দ্বিতীয় হরনাথকেই দেখে আসছে অশোক। এমনিতেই তার মধ্যে সেণ্টিমেণ্ট-ফেণ্টিমেণ্টের ব্যাপারটা খুব বেশি পরিমাণে নেই। তবু এই মুহূর্তে তার চোখের কোন দুর্বল অংশ চুঁইয়ে জল বেরিয়ে আসতে চাইল। কাঁপা গলায় অশোক বলল, 'কেন সম্ভব না কাকা?'

'তুই একটা কথা না ভেবেই এ সব দামী দামী জিনিস নিয়ে এসেছিস অশোক।'

'তোমাদের জন্যে ক'টা জামাকাপড় আনব, এর মধ্যে ভাবাভাবির কী আছে?'

'আছে রে, আছে। আমরা যারা এই বস্তিতে থাকি তারা সবাই খুব গরীব। আমাদের সবারই নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, তাই কিনা?'

'হ্যাঁ। কিন্তু—'

হাত তুলে অশোককে থামিয়ে দিতে দিতে হরনাথ বলতে থাকে, 'হঠাৎ যদি তোর দেওয়া দামী দামী জামা-কাপড় পরতে শুরু করি, বস্তির সবাই কী ভাববে? ভাইপো কল-কারখানার মালিক হয়েছে বলে আমরা বড়লোকি চাল দেখাচ্ছি—এমন কথা বলাবলি করবে না?' একটু থেমে দম নিয়ে ফের বলে, 'সুখে-দুঃখে সারাজীবন আমরা একসঙ্গে আছি। ক'টা জামা-কাপড়ের জন্যে ওদের চোখে আলাদা হয়ে যেতে চাই না অশোক।'

অশোক চমকে উঠল। আজ দুপুরে অবিকল এই রকম একটা

ব্যাপারের জন্য পারমিতা চ্যাটার্জিকে রূঢ় কর্কশ ভাষায় যা খুশি তাই বলেছে সে। বলা যায় চাবুকই চালিয়েছে একরকম। পারমিতা যেমন কলকাতার তিরিশ লাখ বস্তিবাসীর ভেতর থেকে মোটে দশ হাজার মানুষকে বেছে নিয়ে একটা প্রিভিলেজড ক্লাস বানিয়ে তুলেছেন তেমনি সে-ও কি ক'টা দামী পোষাক দিয়ে এই ব্যারাক বাড়ির অন্য সবার থেকে হরনাথদের আলাদা করে ফেলছিল না? অবশ্য এ জাতীয় কোন কিছু ভেবেই সে ঐ দামী জামা-কাপড়গুলো কিনে আনে নি। হরকাকা মালতী কাকিমাদের দেবার ইচ্ছে হয়েছিল বলেই এনেছে।

হরনাথ ফের বলল, 'ঐ জামা-টামাগুলো যাবার সময় নিয়ে যাস অশোক।'

মালতী বিমূঢ়ের মতো একবার স্বামীর দিকে, আরেক বার অশোকের দিকে তাকাতে লাগল। সোনা, নান্টু আর ঝিন্টুর মুখের দিকে এখন আর তাকানো যায় না। বিষণ্ণ করুণ মুখে তারা যে যার জামা-টামা আবার প্যাকেটে পুরে ফেলতে লাগল।

অশোক বলল, 'ঠিক আছে, নিয়েই যাব—'

মালতী অনেকক্ষণ দ্বিধার পর ভয়ে ভয়ে নীচু গলায় স্বামীকে বলল, 'বড়মুখ করে ছেলেটা জিনিসগুলো এনেছিল। ফিরিয়ে দেওয়াটা—'

হরনাথ রাগ করল না, ধমকাল না, শান্ত গলায় বলল, 'ফিরিয়ে দিলেই সব দিক থেকে ভাল হবে। এ কী, তুমি এখনও বসে আছ, ছেলেটাকে তো কিছুই খেতে দিলে না?'

হাতের ভর দিয়ে উঠতে উঠতে ধরা গলায় মালতী বলল, 'এই আনছি।'

অনেক আশা নিয়ে এতদিন পর এই ব্যারাক বাড়িতে এসেছিল অশোক কিন্তু প্রথমেই সিমফনিতে সুর কেটে গেছে। কিছুই ভাল লাগছে না অশোকের। সে বলল, 'কাকিমা, তুমি খাবার-টাবার নিয়ে এসো। আমি ততক্ষণ রেখাদের ঘর থেকে ঘুরে আসি।'

হরনাথ এবং মালতী একই সঙ্গে বলে উঠল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ যা, বেশি

দেরি করিস না।'

'আচ্ছা—' রেখাদের জন্য যে জামা-কাপড় এনেছিল তক্তাপোষ থেকে সেগুলো তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল অশোক।

ছয়

বিশাল উঠোন পেরিয়ে রেখাদের ঘরের সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেল অশোক। ভেতরে ভেতরে কোথায় যেন খানিকটা আড়ষ্টতা কাজ করছে। অথচ এই ব্যারাক বাড়ি থেকে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্ল্ডে চলে যাবার আগে রেখাদের সঙ্গে দেখা করতে এসে এভাবে কখনও সে দাঁড়িয়ে পড়ে নি। সোজা ঘরে ঢুকে গেছে।

বাইরের বারান্দায় কাউকে দেখা যাচ্ছে না। অশোক একটু কেসে গলা সাফ করে নিয়ে ডাকল, 'শ্যামলী, যমুনা—'কেন যে রেখার নামটা মুখে আনতে পারল না সে, নিজেই বুঝতে পারল না।

'কে ?' ঘরের ভেতর থেকে ছুটে বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এসেই যমুনা আর শ্যামলী প্রথমটা দারুণ অবাক হয়ে গেল। খানিকটা নার্ভাসও। অশোককে এ সময় এখানে দেখবে, ওরা ভাবতেও পারে নি। বিস্ময়টা কাটলে তুজনে একসঙ্গে চাপা গলায় বলে উঠল, 'আপনি!' তার পরেই দ্রুত ঘরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'দিদি দিদি, অশোকদা এসেছে।'

দিদি মানে রেখা। মাত্র দশ পনেরো ফুট দূরে ঘরের ভেতর সে রয়েছে এবং শ্যামলী যমুনার চেঁচামেচি শুনে বুঝতেও পেরেছে অশোক এসেছে। কিন্তু তার সাড়া পাওয়া গেল না। আগে হলে অশোকের নাম শুনলেই তু'চোখে হাসির আভা মেখে রেখা ছুটে বেরিয়ে আসত। তার সারা মুখ খুশিতে চকচক করতে থাকত। অশোক বুকের ভেতর একটা ধাক্কা অনুভব করল যেন।

যমুনা শ্যামলী এবার অশোককে বলল, 'বাইরে দাঁড়িয়ে কেন ?

ভেতরে আসুন।'

রেখার এই দুটো বোন আগে তাকে দেখলে দারুণ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত। কিন্তু এখন নিজেদের তারা গুটিয়ে নিয়েছে। কথা বলছে ঠিকই, তবে অনেকটা দূর থেকে যেন। তা ছাড়া ওরা আপনি-টাপনি করে বলছে।

অশোক আর দাঁড়াল না। উঠোন থেকে বারান্দায় উঠে এসে জুতো খুলতে খুলতে বলল, 'তোরা কি আগে আমাকে আপনি করে বলতিস?'

যমুনা আর শ্যামলী আস্তে করে বলল, 'না।'

'তা হলে হঠাৎ আমার এত সম্মান বেড়ে গেল কেন?'

যমুনা উত্তর দিল না। তবে শ্যামলী বলল, 'আগের মতো তুমি করেই তো বলতে ইচ্ছা করে।'

অশোক বলল, 'প্রবলেমটা কোথায়?'

'ভয় করে যে—'

'কেন?'

'আপনি বিরাট বড়লোক হয়ে গেছেন। অনেক কল-কারখানার মালিক, তাই—'

অশোকের জুতো খোলা হয়ে গিয়েছিল। শ্যামলী তার সঙ্গে ফাজলামো করছে কিনা বুঝবার জন্য মেয়েটার মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু না, তার মুখে সে রকম কোন লক্ষণই নেই। অশোক বলল, 'আমি বিরাট বড়লোক হয়েছি! একটি থাপ্পড় মেরে চাঁদি উড়িয়ে দেব। আগের মতো তুমি করে বলবি, বুঝলি?'

শ্যামলী এবং যমুনা ঘাড় কাত করল কিন্তু মুখে কিছু বলল না।

অশোক এবার ঘরে ঢুকে পড়ল। ময়লা চিটচিটে বালিশ, পুরনো দাগ-ধরা তোষক, তালিমারা কাঁথা, ইত্যাদি ইত্যাদি সবই আগের মতো রয়েছে। পায়ার তলায় ইট বসিয়ে বসিয়ে তক্তাপোষটা অনেকখানি উঁচু করা হয়েছে। সেটার তলায় রাজ্যের জিনিসপত্র—হাঁড়িকুঁড়ি, টিনের সুটকেস থেকে বেলো-ছেঁড়া হারমোনিয়াম, পানের

ডাবর, সবই পাওয়া যাবে। ঘরের অন্য দিকে একটা সস্তা দামের টেবলের ওপর যমুনা শ্যামলীর বই-টই, খাতার পাহাড়। খুঁজলে ওগুলোর ভেতর রেখারও দু-চারখানা বই পাওয়া যাবে। বই-খাতার পাশে একটা গোল টাইমপিস।

ঘরটার এক দেয়ালে রবীন্দ্রনাথের একখানা ছবি ঝুলছে, আরেক দেয়ালে বাঙলা ক্যালেণ্ডার। মেঝের এক কোণে লক্ষ্মী এবং মা কালীর পট সাজানো। বাইশ তেইশ বছর ধরে রেখাদের এই ঘরে আসছে অশোক। এখানকার সব কিছুই তার মুখস্থ। কোথায় কী আছে চোখ বুজে সে বলে দিতে পারবে।

যাই হোক, তক্তাপোষে বিছানার একধারে শুয়ে আছে রেখার মা। বরাবরই অশোক লক্ষ্য করেছে, মহিলা দারুণ রুগ্ন, শরীরে মাংস বলতে কিছু নেই। সবই হাড় আর চামড়া। মাসখানেক আগে শেষ বার সে যখন এ বাড়িতে এসেছিল তখনও রেখার মায়ের যা চেহারা দেখেছে তা শুকিয়ে এখন অর্ধেকে দাঁড়িয়েছে। বোঝা যাচ্ছে, মাঝখানে খুবই ভুগেছে মহিলা।

তক্তাপোষের গা ঘেঁষে মেঝেতে বসে মায়ের জন্য খলে মধু দিয়ে কবিরাজী ওষুধ মাড়ছিল রেখা। অশোক লক্ষ্য করল, তার চেহারা বেশ খারাপ হয়ে গেছে। সারা শরীরে এবং জামাকাপড়ে অযত্নের ছাপ। চোখাচোখি হতেই নিরুত্তাপ গলায় রেখা বলল, 'বোসো।' বোনেদের বলল, 'একটা মোড়া বার করে দে তো—'

ওদিকে রেখার মা-ও ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তাড়াতাড়ি উঠে বসতে বসতে বলল, 'বোসো বাবা, বোসো।'

তক্তাপোষের তলা থেকে শ্যামলী একটা মোড়া বার করে এনেছিল। অশোক তাতে বসল না। সোজা এগিয়ে গিয়ে তক্তাপোষের এক ধারে বসে পড়ল।

রেখার মা চেঁচিয়ে উঠল, 'এ কি বাবা, তুমি এই নোংরা বিছানায় বসলে কেন!'

অশোক হাসল, 'আমি কি আজ নতুন এই বিছানায় বসছি

মাসিমা ?'

সঙ্কোচে একেবারে কুঁকড়ে গেছে রেখার মা। অশোকের কথার উত্তর না দিয়ে দারুণ বিব্রতভাবে বলতে লাগল, 'না বাবা, এই রোগীর বিছানায় তোমার বসা ঠিক না। কত দিন এটায় শুয়ে শুয়ে ভুগলাম। ধোওয়া-টোওয়া হয়নি। তুমি ঐ মোড়াটায় বোসো—'

'ঠিক আছে মাসিমা, কিচ্ছু হবে না।'

রেখার মা আবার কী বলতে যাচ্ছিল, রেখা তাকে থামিয়ে দিল। বলল, 'তুমি একশো বার বললেও ওকে মোড়ায় বসাতে পারবে না। ও আজ আমাদের মহানুভবতা দেখাতে এসেছে।'

অশোক চমকে উঠল। দ্রুত ঘাড় ফিরিয়ে একবার রেখাকে লক্ষ্য করল। রেখা কিন্তু তার দিকে তাকালই না, মুখ নীচু করে গভীর মনোযোগে ওষুধ পিষে যেতে লাগল।

রেখার মা কিন্তু মেয়ের ওপর ভয়ানক রেগে গেল। দুর্বল গলায় হাড়সর্বস্ব শরীরের সবটুকু জোর ঢেলে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'এ কী কথার ছিরি! এতদিন বাদে ছেলেটা এসেছে, তাকে খোঁচা না মেরে একটু ভাল ব্যবহার করলে ক্ষতি কী?'

মা কোন্ অসম্ভব ভবিষ্যতের কথা ভেবে তাকে বকাবকি করছে, রেখার বুঝতে অসুবিধা হয় না। শুধু শুধু দুরাশার পিছনে ছুটে যে লাভ নেই, এটা বলতে গেলেই এখন বিস্ফোরণ ঘটে যাবে। কাজেই চুপ করে থাকা ভাল। রেখা মায়ের কথার উত্তর দেয় না।

রেখার মা কাঁচুমাচু মুখে অশোককে বলে, 'রেখার কথায় তুমি কিছু মনে করো না বাবা।'

রেখা মনে মনে হাসে, আবার দুঃখও হয় তার। বহুদূর আকাশের উড়ন্ত সোনার পাখির পিছনে মা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। মা বড় বেশি আশাবাদী। এক সময় রেখাও তাই ছিল। এখন তার মোহ ভেঙে গেছে, অন্তত অশোক সম্পর্কে।

রেখা সম্বন্ধে কোন রকম মন্তব্য না করে অশোক বলে, 'আপনার অসুখের কথা শুনেছিলাম। নানা ঝামেলার জন্যে আসতে পারিনি।

আসলে আপনার অসুখটা যে খুব সীরিয়াস তা জানতাম না। জানলে নিশ্চয়ই একবার আসতাম।'

রেখা বলে উঠল, 'দেশের টপমোস্ট ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট অশোক ব্যানার্জি বস্তির এক গোবেচারা, দারুণ আশাবাদী মহিলাকে তার অসুখের সময় না আসার কৈফিয়ৎ দিচ্ছে। এতে মহিলাটি আহ্লাদে নিশ্চয়ই গলে যাবে, কিন্তু এই কৈফিয়তের দরকার ছিল না।'

রেখার মা এবার ক্ষেপেই উঠল। তার পক্ষে যতটা সম্ভব গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলল, 'অসভ্য মেয়ে, আবার?'

রেখা উত্তর দিল না। তার দিকে এবার না তাকিয়ে অশোক রেখার মাকে জিজ্ঞেস করল, 'অসুখটা কী হয়েছিল আপনার?'

এবার উত্তরটা দিল যমুনা, 'মায়ের টাইফয়েড হয়েছিল।'

'কোন ডাক্তার দেখেছে?'

'ডাক্তার সোম।'

'এখনও দেখছে?'

রেখার মা বলল, 'আমি তো ভালই হয়ে গেছি। আর দেখার কী দরকার।'

অশোক বলল, 'ভাল হয়ে গেছেন মানে? জ্বরটা হয়তো ছেড়েছে কিন্তু শরীরের কী হাল হয়েছে? এখনও অনেক দিন ভাল ডাক্তারের ট্রিটমেন্টে থেকে নিয়ম করে ওষুধ, টনিক এ সব খাওয়া দরকার।'

যমুনা বলল, 'মা কবিরাজী ওষুধ খাচ্ছে।'

'কবিরাজী ওষুধ!' বলেই অবাক হয়ে গেল অশোক। এ ভাবে এই স্টাইলে কখনও সে কথা বলে না। পেসিমিস্ট সীনিক অশোকের বলার ধাঁচ হল কাটা-কাটা, রুক্ষ, চাঁছাছোলা। কিন্তু নরম গলায় এত আগ্রহ নিয়ে রেখার মায়ের শরীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে সে যে এত কথা বলছে তা কি এদের খুশি করার জন্য? ভেতরে ভেতরে সে কি বদলে যাচ্ছে?

যমুনা কিছু বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই রেখার মা বলে উঠল, 'আমার কথা থাক অশোক। তুমি কেমন আছ বাবা?'

'আমি ভালই আছি। কিন্তু মাসিমা, আপনার জন্যে খুব চিন্তা হচ্ছে। এখন ত্নু-চারটে কবিরাজী বড়িতে আপনার শরীর সারবে না। একটা মেডিক্যাল চেক-আপ করা দরকার। ক'দিনের জন্যে বাইরে কোথাও ঘুরিয়ে আনতে পারলে ভাল হয়।'

এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি রেখা। ঘাড় গুঁজে মায়ের জন্য কবিরাজী বড়ি গুঁড়ো করেই যাচ্ছিল। আচমকা মুখ তুলে হেসে হেসে হাততালি দিতে দিতে বলতে লাগল, 'বা, বা, বা—'

চমকে রেখার দিকে ঘুরে বসল অশোক। বলল, 'কী হল।'

রেখা অশোকের কথার উত্তর দিল না। মায়ের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল, 'মা, তোমার আর চিন্তা নেই। মুখ ফুটে যদি একটু বল, তোমার জন্যে কলকাতার সেরা সেরা ডাক্তার নিয়ে একটা মেডিক্যাল বোর্ড বসে যাবে। তুমি চাইলে পুরী, দার্জিলিং, কাশ্মীর কি সিমলায় চেহারা ফেরাতেও যেতে পারো। চাইবে নাকি?'

রেখার কথার মধ্যে কী আছে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না অশোকের। তার মুখচোখ ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে।

রেখার মা ধমকে ওঠে, 'আঃ রেখা, তোকে নিয়ে আমি আর পারি না।'

রেখা যেন মায়ের কথা শুনতেই পায় না। সমানে বলতে থাকে, 'মা, ওকে বলে দাও তোমার স্বামী তিনশো টাকার লেজার কীপার। তার পক্ষে টাইফয়েডের পর তোমাকে কবিরাজী বড়ির বেশি কিছু খাওয়ানো সম্ভব না।' একটু থেমে শ্বাস টেনে আবার শুরু করে, 'ও অনেক কথাই ভুলে গেছে। ওকে মনে করিয়ে দাও, এর আগেও তোমার টাইফয়েড হয়েছে, নিমুনিয়া হয়েছে, জণ্ডিস হয়েছে, এশিয়াটিক কলেরা হয়েছে। মেডিক্যাল বোর্ড ছাড়াই, সিমলা কাশ্মীর না গিয়েই চার আনা দামের হোমিওপ্যাথিক গুলি, ত্নু-টাকার কবিরাজী বড়ি, বড় জোর চার টাকা ভিজিটের ডাক্তার সোমের ওষুধ খেয়ে যখন এতদিন টিকে আছ, এবারও টিকে যাবে।'

রেখার মা বলল, 'তুই থামবি বাঁদর মেয়ে?'

রেখা হাসতে লাগল।

অশোকের মাথার ভেতরটা জ্বালা করছিল। সে বলল, 'মেডিক্যাল বোর্ড আর দার্জিলিঙ সিমলায় যাবার সুযোগ থাকলে সেটা নেওয়া কি অন্যায়? অসুস্থ রুগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে বিছানায় পড়ে থাকাটা বুঝি দারুণ একটা হীরোয়িক ব্যাপার?'

রেখা আস্তে আস্তে রিদম তুলে আবার হাততালি দিয়ে উঠল। বলল, 'ফাইন, ফাইন। তোতাপাখির বুলি একেবারেই বদলে গেছে।'

রেখার কথাগুলো ধারালো ফলার মতো মাথার ভেতর কোথায় যেন বিঁধে গেল।

হকচকিয়ে গেল অশোক। সত্যি সত্যিই কি সে তোতাপাখি? নিজের অজান্তেই বড়লোকি চালের ব্রিফ নিয়ে ওকালতি করতে নেমেছে? অ্যাফ্লুয়েন্ট সোসাইটির লোকজন ছাড়া কে আর মেডিক্যাল বোর্ডের কিংবা দার্জিলিঙ সিমলায় হাওয়া বদলাবার কথা ভাবতে পারে? অশোক রেখার মায়ের অসুখ প্রসঙ্গে আর কিছু বলল না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর অশোক এক সময় বলল, 'মেসোমশাইকে তো দেখতে পাচ্ছি না মাসিমা—'

রেখার মা বলল, 'এখনও ফেরে নি।'

'কাকিমার কাছে শুনলাম, বড়বাজারে খাতা লেখার সেই পার্ট-টাইম কাজটা নাকি মেসোমশায়ের নেই।'

'না। মাসখানেক হলো ওরা ছাড়িয়ে দিয়েছে। আজকাল অফিস ছুটির পর এখানে ওখানে কাজের খোঁজে ঘোরে। ফিরতে ফিরতে সাড়ে দশটা এগারোটাও হয়ে যায়। অফিসের যা মাইনে তাতে তো আর চলে না।'

'নতুন পার্ট টাইম কাজ হয়েছে?'

'না, এখনও হয়নি। দু-একজন আশা দিয়েছে। এ মাসে হয়েও যেতে পারে।'

রেখা কথার ফাঁকে চেঁচিয়ে ওঠে, 'মা, আমাদের কী সৌভাগ্য গো!'

চোখ কুঁচকে রেখার মা তাকায়, 'কিসের আবার সৌভাগ্য ?'

'তুমি যার সঙ্গে কথা বলছ তার আসল পরিচয়টা জানো ?'

বিরক্ত গলায় রেখার মা বলল, 'কী পাগলের মতো কথা বলছিস রেখা! আমাকে তুই অশোককে চেনাচ্ছিস ? এই ব্যারাক বাড়িতে আমার চোখের সামনে বড় হলো। আমার পেটের ছেলের মতো—'

রেখা হেসে হেসেই বলল, 'তুমি যাকে চোখের সামনে বড় হতে দেখেছ সে কিন্তু আর নেই মা।'

রেখার মা মিমূঢ়ের মতো বলল, 'তবে এখন এই ঘরে বসে যে আমার সঙ্গে কথা বলছে সে কে ?'

'নাম এক, চেহারা এক, কিন্তু মানুষটা একেবারেই আলাদা।'

ওষুধ মাড়া হয়ে গিয়েছিল। রেখা খলসুদ্ধ উঠে এসে মাকে বলল, 'এটা খেয়ে নাও।'

রেখার মা খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছিল। বলল, 'রেখে দে ওষুধ, আমি খাব না। অশোকের সম্বন্ধে তুই যা বলছিস তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'লক্ষ্মী মা, ওষুধটা খেয়ে নাও। তারপর বুঝিয়ে দিচ্ছি।'

নিতান্ত অনিচ্ছায় রেখার হাত থেকে ওষুধ নিয়ে খেয়ে নিল রেখার মা। সে জানে, না খেলে মেয়ে ছাড়বে না।

এবার রেখা বলল, 'তুমি তো পাকিস্তান হবার পর সেই যে এই ব্যারাক বাড়িতে এসে ঢুকেছ, তারপর আর কোথাও বেরুলে না। এখানেই পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর মুখ গুঁজে পড়ে রইলে। দিনের পর দিন রান্না করলে, বাসন মাজলে, কাপড় কাচলে, আমাদের বড় করে তুললে। একটু যদি বাইরের খবর রাখতে, বুঝতে পারতে অশোক ব্যানার্জি এ দেশের কত বড় একজন শিল্পপতি। কোটি কোটি টাকার মালিক সে। এ সব জানলে তিনশো টাকা মাইনের কেরানীর বউ হয়ে ময়লা ছেঁড়া বিছানায় তাকে বসিয়ে কথা বলতে তোমার গায়ের রক্ত হিম হয়ে যেত।'

এবার সত্যি সত্যিই ক্ষেপে গেল অশোক। তবে কোন রকম

বিস্ফোরণ ঘটাল না। দাঁতে দাঁত চেপে আস্তে করে বলল, 'তোমার কী হয়েছে রেখা? প্রথম থেকেই বার বার বিলো দি বেল্ট হিট করে যাচ্ছ কেন?'

রেখা উত্তর দিল না।

রেখার মা বলল, 'অশোক বাইরে গিয়ে যা-ই হোক না, ও আমাদের চোখে সেই অশোকই রয়েছে।'

রেখা ঠোঁট কামড়ে একটু হাসল। বলল, 'মা, জীবনে এত কষ্ট করেও, এত ঘা খেয়েও কি করে যে তুমি এত স্বপ্ন দেখতে পারো, বুঝতে পারি না।'

রেখার মা থতমত খেয়ে গেল, 'কীসের স্বপ্ন?'

'আকাশের অনেক দূরে যে সোনার হাঁস উড়ে যাচ্ছে সেটা ধরার স্বপ্ন।'

'তার মানে?'

অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে অশোক বলল, 'বুঝতে পারছেন না মাসিমা?'

'না তো।' রেখার মা বিমূঢ়ের মতো মাথা নাড়ল।

অশোক বলল, 'আমাকে অ্যাটাক করার জন্যে ঐ সব বলছে রেখা। তবে মাসিমা আমি সোনার হাঁসও হইনি, ডানা গজিয়ে আকাশেও উড়িনি। আমি যেমন ছিলাম যা ছিলাম তা-ই আছি, তা-ই আছি, তা-ই আছি।'

রেখা বলল, 'ইণ্ডিয়ার শ্রেষ্ঠ শিল্পপতির এত করুণ ভাবে আমাদের মতো বস্তিবাসীর কাছে কৈফিয়ৎ দেবার কোন প্রয়োজন নেই।'

রেখার মা এবার ভীষণ রেগে গেল। বলল, 'তুই চুপ করবি রেখা?'

এক পলক মাকে দেখল রেখা। বলল, 'ঠিক আছে, আমি মুখ বুজে থাকতে চেষ্টা করছি।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ। তারপর অশোক বলল, 'মাসিমা একটা আর্জি আছে। আপনাকে কিন্তু রাখতে হবে।'

রেখার মা বলল, 'আর্জি আবার কী! কী করতে হবে, বল না—'

সেই জামা-কাপড়ের প্যাকেটগুলো দেখিয়ে অশোক বলল, 'আপনাদের জন্যে ক'টা জিনিস এনেছিলাম। এগুলো নিলে আমি খুশি হব।'

রেখার মা বলল, 'নিশ্চয়ই নেব। তুমি এনেছ—'

তার কথা শেষ হতে না হতেই শ্যামলী আর যমুনা দৌড়ে প্যাকেটগুলোর কাছে চলে এলো। কিন্তু তুলে নেবার আগেই অত্যন্ত গম্ভীর আর রূঢ় গলায় রেখা বলল, 'ওগুলো নিতে হবে না।'

শ্যামলী আর যমুনা থমকে দাঁড়িয়ে গেল। রেখার মা বলল, 'কী হলো? নেবে না কেন?'

'প্যাকেট না খুলেই বলছি, ওগুলো ভীষণ দামী জিনিস। আমাদের মতো বস্তির লোকেদের নোংরা গায়ে উঠলে ওই সব জামাকাপড়ের জাত যাবে।'

একটু আগে হরনাথ এই কথাগুলোই অন্য ভাবে বলেছিল। হ্যাভ-নটদের সেই চিরকালের ফাঁপা অহংকার।

রেখার মা বলল, 'তুই না মুখ বুজে থাকবি বললি?'

আচমকা তীক্ষ্ণ কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে উঠল রেখা, 'থাকতে দিচ্ছ কোথায়? তোমার লজ্জা করে না মা?'

'কীসের লজ্জা?'

'গায়ের চামড়া কি তিন ইঞ্চি পুরু হয়ে গেছে? ঐ সব মহানুভবতার মানে বুঝতে পারো না? সারাটা জীবন তো পনেরো কুড়ি টাকা দামের লালপাড় মোটা শাড়ি পরে কাটিয়ে দিলে। বাকী ক'টা দিন তসর গরদ মুগা গায়ে না তুললেই নয়? কেউ মাংসের টুকরো ছুঁড়ে দিলেই কুকুরের মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে?'

রেখার মা কিছু বলতে পারল না, কুঁকড়ে একেবারে এতটুকু হয়ে গেল।

এদিকে অশোকের সমস্ত নার্ভ সিস্টেমের মধ্যে যেন একটা বিপর্যয় ঘটে গিয়েছিল। শিরদাঁড়া টান টান করে সে বলল, 'এভাবে অপমান করার মানে কী? আমি তো তোমাদের কোন ক্ষতি করিনি।'

রেখা বলল, 'কে কখন কী ভাবে কার ক্ষতি করে তা বোঝানো মুশকিল।'

অশোক স্থির চোখে অনেকক্ষণ রেখাকে দেখল। তারপর বলল, 'তুমি সব লিমিট ক্রস করে যাচ্ছ রেখা। আমার সঙ্গে তোমরা কি কোন সম্পর্ক রাখতে চাও না?'

রেখা কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই বাইরে একটা গলা শোনা গেল, 'অশোকদা, অশোকদা—'

অশোক চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কে রে?'

'আমি—' বলতে বলতে চায়ের দোকানের ললিত উঠোন থেকে বারান্দায় উঠে ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

ললিত এই মুহূর্তে তার খোঁজে এখানে আসবে, অশোক ভাবতে পারে নি। সে কিছুটা অবাক হয়েই জানতে চাইল, 'কী ব্যাপার?'

'পাড়ার ছেলেরা তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। তাদের এখানে ডেকে আনব, না তুমি যাবে?'

'আমার সঙ্গে দেখা করতে চায় কেন?'

'ওদের কাছেই শুনো—'

একটুক্ষণ কী ভাবল অশোক। তারপর তক্তাপোষ থেকে উঠে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করল 'ওরা কোথায় আছে?'

ললিত বলল, 'বাইরের রাস্তায়।'

'চল্—'

রেখার মা ব্যস্তভাবে বলে উঠল, 'এ কি, তুমি চলে যাচ্ছ! একটু চা-ও তো খেলে না।'

'নিশ্চয়ই খাব। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে কথা বলে দশ মিনিটের ভেতর ফিরে আসছি।' বলে ললিতের সঙ্গে বেরিয়ে গেল অশোক। ওদের সঙ্গে কথা বলে তাকে এখানে ফিরে আসতেই হবে। রেখার সঙ্গে তার একটা বোঝাপড়া হওয়া দরকার।

সাত

বাইরের রাস্তায় আসতেই দেখা গেল, চল্লিশ পঞ্চাশটা যুবক তার গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে জটলা করছে। কিছুক্ষণ আগে ললিতের চায়ের দোকানে মোটে চার পাঁচজনকে দেখে গেছে অশোক। খুব সম্ভব তার আসার খবর পেয়ে বাকী সবাই এখানে এসে হাজির হয়েছে।

এই ছেলেদের সবাইকেই চেনে অশোক। প্রত্যেকের নামও তার জানা। শুধু তাই না, এদের মা-বাবা, ভাই-বোন আর্থিক অবস্থা, সব খবরই সে রাখে।

অশোককে দেখে ছেলেগুলো এগিয়ে এলো। সবার আগে আগে রয়েছে রণেশ, ভল্টা আর পল্টু।

রণেশ বলল, 'তোমাকে একটু ডিস্টার্ব করলাম অশোকদা। ললিতকে পাঠিয়ে ডেকে আনলাম। কিছু মনে করো না।'

অশোক হালকা করে বলল, 'আরে না, না, মনে করব কেন? আমি ঠিকই করে রেখেছিলাম, এখানে যখন এসেছি তোদের সঙ্গে দেখা না করে যাব না। তারপর কেমন আছিস বল?'

'হোল-টাইম বেকাররা কেমন থাকতে পারে, নিজেই বুঝে দেখ।'

বল্টু বলল, 'এই দামড়া বয়সে বাপের ধম্মোশালায় ফ্রী-তে আছি, ফ্রী-তে খাচ্ছি বলে দিনরাত খিচির খিচির শুনতে হয়। এক এক সময় সুইসাইড করতে ইচ্ছা হয়।'

ভল্টা বলল, 'লাইফ একেবারে অ্যাসিড হয়ে গেছে।'

পিছন থেকে একজন বলল, 'আমার বাড়িতে নোটিশ ধরিয়ে দিয়েছে, আসছে মাস থেকে ক্যাশ না দিতে পারলে, ফ্রী-তে খাওয়া বন্ধ।'

রণেশ বলল, 'ও-সব কথা থাক। আমাদের চাকরির কী হল অশোকদা? তোমার কথামতো এক মাস আগে অ্যাপ্লিকেসন দিয়ে এসেছি কিন্তু কিছুই তো জানালে না।'

অশোক বলল, 'তোদের চাকরির কথা আমার মনে আছে। চেষ্টাও করছি। কিন্তু এখানে এত রকম ঝামেলা যে তাড়াতাড়ি কিছু করে ওঠা ভীষণ মুশকিল। তবে কথা দিচ্ছি, তোদের জন্যে কিছু করবই।'

'সে তো যখনই ফোন করি তখনই তাই বল। প্রতিশ্রুতি ধুয়ে ধুয়ে জল খেলে কি পেট ভরবে?'

ভিড়ের ভেতর থেকে আরেক জন কে যেন বলে উঠল, 'প্রফেসনাল নেতাদের মত প্রমিসের বিজনেশটা ছাড়ো তো গুরু!'

অশোক চমকে উঠল। রণেশ এবং না-দেখা ছেলেটার কথার ধরন তার ভাল লাগল না। সবাইকে দ্রুত একবার দেখে নিল সে। তার চারপাশে চল্লিশ পঞ্চাশটা যুবকের মুখ কেমন যেন শক্ত আর রূঢ় মনে হচ্ছে, চোখের তারাগুলো স্থির।

অশোক ভেতরে ভেতরে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। বলল, 'প্রমিসের বিজিনেসে আমি নেই। তোদের চাকরি-বাকরি হলে আমিই সবার থেকে বেশি খুশি হব।' একটু থেমে ফের বলল, 'একটা কথা বিশ্বাস করবি?'

যুবকেরা একসঙ্গে গলা মিলিয়ে বলল, 'কী কথা?'

'আমাকে অত বড় ইণ্ডাস্ট্রিয়াল হাউসের মাথায় বসিয়ে দেওয়া হয়েছে বলেই আমার যা ইচ্ছা করার ক্ষমতা নেই। আমার পাওয়ার খুবই লিমিটেড। আগে থেকেই এমন সব নিয়মকানুন আর পলিসি তৈরি করে রাখা হয়েছে যে সে সব ডিঙিয়ে ইচ্ছামতো কিছু করতে যাওয়া সব সময় সম্ভব না।'

'বিশ্বাস করি না।' যুবকেরা এবার চিৎকার করে উঠল, 'তুমি আমাদের সঙ্গে ভাঁওতাবাজী করছ। একশো উনসত্তরটা কোম্পানির ডিরেক্টর, ম্যানেজিং ডিরেক্টর আর চেয়ারম্যান হয়ে তুমি শ'খানেক ছেলেকে চাকরি দিতে পারো না, দু-বছরের বাচ্চাও এ সব বিশ্বাস করবে না।'

'তোরা আমাকে ভুল বুঝেছিস। দিস ইজ আটার মিস-আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং।' অশোক বোঝাতে চেষ্টা করল, 'আমার অবস্থাটা

বুঝে দেখ।'

রণেশ এবার চেঁচিয়ে উঠল, 'কী আবার বুঝে দেখব! ঐ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল হাইসে যাবার সময় কী বলেছিলে, ভুলে গেছ? নতুন করে তা হলে মনে করিয়ে দিচ্ছি। তুমি বলেছিলে দেশের সোসাল প্যাটার্ণ পাল্টে দেবে।'

ভল্টা বলল, 'এখন শালা কোটি কোটি টাকা, এয়ার-কণ্ডিশাণ্ড গাড়ি, এয়ার-কণ্ডিশাণ্ড বাড়ি, হুইস্কির বোতল, দামী দামী খাবার পেয়ে পেছনের বড় বড় প্রমিস কে আর মনে রাখে! সব ফুট।'

আরেক জন বলল, 'আরামে থেকে থেকে মালের গায়ে কী রকম চর্বি জমেছে ছ্যাখ। শালা হারামী!'

অশোকের মাথার ভেতর কোথায় যেন বারুদের স্তূপে আগুন ধরে গেল। পাড়ার এই ছেলেগুলো এক সময় তাকে শ্রদ্ধা করত, মুখোমুখি পড়ে গেলে সম্ভ্রমের সুরে কথা বলত। কিন্তু আজ? অশোক চিৎকার করে উঠল, 'কে, কে আমাকে হারামী বলল?'

একটি যুবক ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে এলো। তার নাম তপন। সে বেপরোয়া ভঙ্গিতে বলল, 'আমি, আমি বলেছি—'

অশোক বিমূঢ়ের মতো তপনকে দেখতে লাগল। ওর বাবা আলিপুর কোর্টে এক মোক্তারের মুহুরি। পাঁচ ছ'টা ছোট ভাই বোন, চিররুগ্ন কঙ্কালসার মা, এই নিয়ে ওদের সংসার। বাপের অনিয়মিত আয়ে কোন দিন আধপেটা খেয়ে, কোনদিন পুরোপুরি উপোষ দিয়ে বড় হয়ে উঠেছে তপন। এর মধ্যে কী ভাবে যেন স্কুল ফাইনালটা পাশ করে ফেলেছিল। যদিও এ দেশের এডুকেসন সিস্টেম সম্পর্কে কোন রকম শ্রদ্ধা বা আস্থা নেই অশোকের, তবু স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার সময় নিজে তাকে পড়িয়েছে, রেখার কাছ থেকে জোরজার করে টাকা আদায় করে ওর এগজামিনের ফী দিয়েছে। আর সেই তপনই কিনা আজ তাকে এভাবে খিস্তি দিল!

অশোক বলল, 'তুই আমাকে হারামী বললি!' নিজের কানে শুনেও সে যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না।

তপন বলল, 'বলেছি। আবারও বলব। একশো বার বলব।'

অশোক বলল, 'কেন বলবি? আমি তোদের কী ক্ষতি করেছি?'

রণেশ এবার বলল, 'ক্ষতি কর নি? এতগুলো ছেলেকে চাকরি দেবে বলে ঝুলিয়ে রেখেছ। জানি, কোন দিনই আমাদের চাকরি হবে না। আরাম পেয়ে ক্ষমতা পেয়ে তুমি নিজের ব্যাকগ্রাউণ্ড ভুলে গেছ। আর নতুন একটা ট্যাকটিক্‌স নিয়েছ।'

'কীসের ট্যাকটিক্‌স?'

যখনই আমাদের সঙ্গে দেখা হবে কিংবা আমরা ফোন-টোন করব তখনই গলায় মাখন লাগিয়ে বলবে—চেষ্টা তো করছি, পারছি না। আমাদের কাছ থেকে সরে গিয়ে শেষ পর্যন্ত তুমি অ্যাফ্লুয়েণ্ট ক্লাসের দালাল হয়ে গেলে অশোকদা?'

অশোকের পায়ের তলায় টালিগঞ্জের এই গলি এবং বিশাল বস্তির ব্যাকগ্রাউণ্ড যেন দুলতে লাগল। সে চিৎকার করে বলল, 'না না, আমি দালাল হয়ে যাই নি। আর ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট কমিউনিটির ইন্টারেস্ট দেখবার জন্যে আমি মোটেই ওখানে যাই নি।'

'কী করতে গেছ, তা আমরা জানি। শালা খচড়া!' পেছন থেকে আবার কে একজন বলে ওঠে।'

'কে? কে?' অশোক আবার চেঁচায়।

'আমি শিবু—' বলে শিবু নামের ছোকরাটি সামনে এগিয়ে এসে অকথ্য কিছু খিস্তি দেয়।

অশোকের রক্ত ঝাঁ-ঝাঁ করতে থাকে। সে আরেক বার চিৎকার করে উঠবার আগেই ভণ্টা বলে, 'আমাদের তো ঝুলিয়েছই, তার ওপর একটা ভাল মেয়েকে ফাঁসিয়ে হড়কে গেছ। তোমাকে—'

তীব্র চাপা বিকৃত গলায় অশোক বলে, 'কাকে, কাকে ফাঁসিয়েছি আমি?'

'কাকে, জানো না মদন? রেখাদিকে—'

অশোক গর্জে ওঠে, 'শাট আপ রাসকেল, শাট আপ। তোমার দাঁত আমি উড়িয়ে দেব।' বলেই অন্ধের মতো সামনের দিকে ঘুষি

ছোঁড়ে অশোক।

কয়েক জন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে, 'হারামীগিরি করে আবার রোয়াব ফলাবে! শালাকে একটু রগড়ে দিতে হবে।' বলতে বলতেই ভিড়টা একটু দূরে ছড়িয়ে যায়। তারপর ইঁটের টুকরো এসে পড়তে থাকে অশোকের ওপর। প্রথমে একটা দুটো, তারপর বৃষ্টির মতো। দুটো হাত ঢালের মতো তুলে ধরে নিজের মুখ আর মাথা বাঁচাতে চেষ্টা করে অশোক। সে বুঝতে পারে, ইঁটের টুকরোর ঘায়ে তার মাথা, থুতনি, হাত এবং গলা ফেটে রক্ত গড়িয়ে আসছে। তার মধ্যেই শুনতে পায় শোফারের গলা, 'আইয়ে সাব, গাড়ি পর চলা আইয়ে—'

অশোক নড়ে না। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইঁটের ঘা খেতে থাকে।

এদিকে যুবকদের এক দলের আক্রোশ গিয়ে পড়েছে অশোকের লিমুজিনের ওপর। সেটার ওপরও ঝাঁকে ঝাঁকে রাস্তার খোয়া পড়তে থাকে। টের পাওয়া যায়, গাড়িটার কাচ-টাচ ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে।

আরো ভয়াবহ কিছু ঘটে যেতে পারত। কিন্তু তার আগেই রাস্তার চেঁচামেচি শুনে ব্যারাক বাড়ি থেকে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এলো রেখা, রেখার দুই বোন শ্যামলী আর যমুনা। তাদের সঙ্গে এসেছে হরনাথ, মালতী, নান্টু, ঝিন্টু, সোনা। চিৎকার করে হরনাথ আর মালতী বলতে লাগল, 'কী করছিস তোরা? ছেলেটাকে মেরে ফেলবি নাকি?'

রেখা দৌড়ে অশোক আর রণেশদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল। দু-হাত তুলে চেঁচাতে লাগল, 'থাম থাম—'

ইঁট ছোড়া বন্ধ হল। ওধার থেকে বল্টু দারুণ উত্তেজিত গলায় বলল, 'তুমি সরে যাও রেখাদি। মিডিলে দাঁড়িয়ে কিচাইন করো না।'

'না, সরব না। তোরা এখন বাড়ি যা তো—'

হরনাথও এগিয়ে এসেছিল। বলল, 'তোরা কী ভেবেছিস, অ্যাঁ? যা খুশি তাই করবি তোরা?'

ভল্টা বলল, 'করতে আর পারলাম কোথায়? ভেবেছিলাম

বড়লোকের এই দালালটাকে একটু ভাল করে কড়কে দেব। আপনি চলে যান হরকাকা।'

হরনাথ বলল, 'না-না, কিছুতেই না। তোরা যা।'

রেখা এপাশে চলে এলো। বলল, 'তোদের কাছে হাতজোড় করছি। অনেক হয়েছে, এবার যা।'

রণেশ বলল, 'এ লোকটাকে কেন বাঁচাতে চেষ্টা করছ রেখাদি? রাসকেলটা কমফোর্ট আর মানি পেয়ে পা থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত বদলে গেছে। তোমাকে বিট্রে করেছে, হরকাকাদের বিট্রে করেছে, চাকরি দেবে বলে আমাদের খেলাচ্ছে। ওকে স্লাইট রগড়ে দেওয়া দরকার কিনা, তুমিই বল?'

রেখা গলার শিরা ছিঁড়ে এবার স্বরটা সাত পর্দা ওপরে তুলল, 'আমাদের বিট্রে করেছে, আমরা বুঝব। তোদের কিছু করতে হবে না। যা, চলে যা এখান থেকে।'

রণেশ বলল, 'ঠিক আছে, তুমি যখন বলছ, আমরা যাচ্ছি। তবে ঐ মালটা কারো সিমপ্যাথি পাবার যোগ্য না রেখাদি।'

বল্টু দু'হাতের তালু উল্টে দিয়ে বলল, 'যাঃ বাবা, তোমার জন্যে এত ঝামেলা করলাম আর তুমিই এখন উল্টো গাইছ!'

ভিড়টা আস্তে আস্তে হাল্কা হয়ে যেতে থাকে।

এদিকে মালতী দু-হাতে অশোককে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করেছে। শাড়ির আঁচল দিয়ে তার মুখ আর মাথার রক্ত মুছতে মুছতে বলে, 'ইস, ছেলেটাকে একেবারে খুন করে ফেলেছে।'

সোনা নান্টু ঝিন্টু শ্যামলী আর যমুনাও সমানে কাঁদছে।

পাড়ার ছেলেরা সবাই চলে যাবার পর হরনাথ আর রেখা অশোকের সামনে চলে এলো। রেখা বলল, 'এক্ষুণি ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে কাকা।'

'হ্যাঁ।' হরনাথ মাথা নাড়ে, 'অশোকের গাড়ি আছে। ওটায় করেই নিয়ে যাই।' অশোককে বলে, 'আমি ধরছি। একটা হাত আমার কাঁধের ওপর তুলে দে। গাড়ি পর্যন্ত একটু কষ্ট করে হেঁটে

চল। পারবি তো?'

অশোক হরনাথের কাঁধে হাত রাখল না। বলল, 'ভেবো না কাকা, আমার তেমন কিছু হয়নি। একটু আইডিন-টাইডিন লাগিয়ে দিলেই হবে।' মালতীকে বলল, 'কেঁদো না কাকিমা, কেঁদো না।'

হরনাথ বলল, 'রক্তে সারা গা ভেসে যাচ্ছে। কতটা কী চোট লেগেছে কে জানে, বলে কিনা আইডিন লাগালেই হবে!' বলতে বলতেই ছেলেবেলায় কথা না শুনলে যেমন ধমকে উঠত সেভাবেই ধমকে উঠল, 'বেশি ওস্তাদির দরকার নেই। চল ডাক্তারের কাছে।'

হরনাথের এই ধমকটুকু বড় ভাল লাগল অশোকের। এই তো সেই চিরকালের চেনা মানুষটা। এই হরনাথ ইউনিয়নের সৎ কর্তব্য-পরায়ণ একনিষ্ঠ নেতা নয়। নয় মালিক পক্ষের বিরুদ্ধে নানা যুদ্ধের সেনাপতি। এ সেই স্নেহপ্রবণ হরকাকা যে মা-বাবা মারা যাবার পর অসীম মমতায় তাকে বুকে তুলে নিয়েছিল। চুপচাপ অশোক এবার হরনাথের কাঁধে হাত তুলে বলে, 'চল—'

রেখা বলল, 'আমিও যাব কাকা—'

হরনাথ বলল, 'আয়—'

মালতী শ্যামলী যমুনারাও আসতে চেয়েছিল। হরনাথ একরকম জোর করেই তাদের বাড়ি পাঠিয়ে দিল।

গাড়ির দিকে যেতে যেতে অশোকের বড় ভাল লাগছিল। মাথায় মুখে চোট না লাগলে রেখা এবং হরকাকাকে আবার এত কাছে পাওয়া যেত না। এই রক্তপাতের জন্য মনে মনে রণেশদের কৃতজ্ঞতা জানাল সে।

কিন্তু গাড়িতে উঠবার আগেই আরেকটা লিমুজিন গলির মুখে এসে দাঁড়াল। সেটা থেকে দ্রুত নেমে এলেন চন্দ্রকান্ত রাহেজা। অশোকের রক্তাক্ত মুখ মাথা এবং তার গাড়ির ভাঙা-চোরা বিধ্বস্ত চেহারা দেখে চমকে উঠলেন, 'স্যার, কেমন করে এ অবস্থা হল!'

অশোক উত্তর না দিয়ে বলল, 'আপনি এখানে! আপনাকে তো আমি ছুটি দিয়েছিলাম!'

রাহেজা বললেন, 'ক্ষমা করবেন স্যার, আপনি ছুটি দিলেও আমি ঠিক নিশ্চিন্ত থাকতে পারছিলাম না। শুয়ে শুয়ে ঘুমও আসছিল না। আমার সিক্সথ সেন্স বলল, আপনি নিশ্চয়ই এখানে এসেছেন। তাই চলে এলাম। কিন্তু স্যার, এ রকম মারাত্মক ইনজুরি হল কী করে?' রাহেজার চোখেমুখে এবং কণ্ঠস্বরে প্রবল উৎকণ্ঠা।

অশোক বলল, 'ও কিছু না। সামান্য একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল।' বলতে বলতেই সে অনুভব করল, মাথার ভেতরটা ঝিমঝিম করছে আর চারপাশের মানুষজন এবং দৃশ্যাবলী ক্রমশ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে।'

এদিকে অশোকের লিমুজিনের ড্রাইভারটা এক ধারে দাঁড়িয়ে ছিল। সে এবার কাছে দৌড়ে এসে জোড় হাতে হাউ-মাউ করে বলতে লাগল, 'দেখিয়ে হামারা সাবকা কেয়া হাল কিয়া—' যা যা ঘটেছে সব রুদ্ধশ্বাসে বলে গেল সে।

রাহেজা দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'হাউ ডেঞ্জারাস! রাফায়েনগুলোর ব্যবস্থা পরে হবে। এক্ষুণি স্যারকে নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়া দরকার—'

হরনাথ আর রেখা বলল, 'আমরা ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাচ্ছি।'

'কোন্ ডাক্তার?'

'আমাদের পাড়াতেই আছে; ডাক্তার তলাপাত্র—'

'ও সব কোয়াকের কাজ নয়। মিস্টার ব্যানার্জি দেশের টপমোস্ট ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। ওঁর জীবনের অনেক দাম। দিন ওঁকে—' এক রকম জোর করেই রাহেজা অশোককে নিজের লিমুজিনে নিয়ে তুললেন।

অশোক বাধা দিতে চেষ্টা করল। বলতে চাইল রেখাদের সঙ্গে পাড়ার এল-এম-এফ ডাক্তার তলাপাত্রের কাছেই যাবে। তার ঠোঁট দুটো সামান্য কাঁপল শুধু কিন্তু গলায় স্বর ফুটল না। জ্ঞানটা পুরোপুরি লুপ্ত হবার আগেই সে টের পেল, রাহেজার কোলে মাথা

রেখে সে শুয়ে আছে আর তার গাড়িটা গলি ছাড়িয়ে ট্রাম রাস্তায় চলে এসেছে।

আজন্মের চেনা টালিগঞ্জের সেই বস্তির সঙ্গে নতুন করে যে সম্পর্কটা হতে যাচ্ছিল, ক্রমশ তা ছিঁড়ে যাচ্ছে। বাজপাখির মতো ছোঁ মেরে চন্দ্রকান্ত রাহেজা আবার তাকে অ্যাফ্লুয়েণ্ট সোসাইটিতে ফিরিয়ে নিয়ে চলেছেন।

আট

জ্ঞান ফেরার পর অশোক টের পেল, তার মাথায় হাতে এবং বুকে অনেকগুলো ব্যাণ্ডেজ। সে শুয়ে আছে সিঙ্গেল বেড খাটের ধবধবে সাদা বিছানায়। মাথার দিকে খানিকটা দূরে চমৎকার ওয়ার্ডরোব, ড্রেসিং টেবল। টেবলের পাশে উঁচু স্ট্যাণ্ডে বিদরির কাজ করা ফুলদানি, তাতে রজনীগন্ধা। পায়ের দিকে গোটাকয়েক সোফা, সেণ্টার টেবল, একটা গদিমোড়া আর্ম চেয়ার, ফোন। সামনে প্রকাণ্ড দেয়ালের গোটাটা জুড়ে কাচের জানালা, তার ওপর দামী পর্দা টানা। ঘরের ফ্লোর পুরু কার্পেটে মোড়া। পেছন দিকের দেয়ালে এয়ারকুলার বসানো।

কাচের জানালার পর্দাটা যেখানে যেখানে পুরো ঢাকা পড়েনি, সেই সব ফাঁক দিয়ে টলটলে সোনালী রোদ এসে পড়েছে ঘরে। অর্থাৎ সবে সকাল হয়েছে। বাইরে প্রচুর গাছপালা চোখে পড়ে। সেখান থেকে পাখিদের অবিরাম কিচির মিচির ভেসে আসছে। আরো দূরে ক্যালকাটা মেট্রোপলিসের সুবিশাল স্কাইলাইন। বিরাট বিরাট সব হাইরাইজ বিল্ডিং পিকচার পোস্টকার্ডের দৃশ্য হয়ে যেন দাঁড়িয়ে আছে।

এই মুহূর্তে অশোকের মাথার ভেতরটা ভয়ানক দুর্বল। এই ঘর এবং চারপাশের দৃশ্যাবলী তার কাছে খুবই অচেনা মনে হচ্ছে। কী

করে সে এখানে এলো বা কে তাকে নিয়ে এসেছে, কিছুই মনে পড়ছে না। অলীক কোন স্বপ্নের ঘোরেই রয়েছে সে।

এখন কী করবে বা কী করা উচিত, অশোক যখন কিছুই ভেবে পাচ্ছে না সেই সময় সাদা ইউনিফর্ম পরা চমৎকার চেহারার এক তরুণী নার্স ঘরে ঢুকল। তার এক হাতে ছোট্ট মেডিকেল ব্যাগ, আরেক হাতে টাটকা একগুচ্ছ রক্তগোলাপ। সোজা অশোকের কাছে এসে খুব মিষ্টি করে হাসল সে। মাথাটা সামনের দিকে সামান্য নুইয়ে বলল, 'গুড মর্ণিং স্যার।'

আবছা গলায় অশোক বলল, 'গুড মর্ণিং।'

'এখন কেমন লাগছে?'

'উইক।'

'তা তো লাগবেই। প্রচুর ব্লিডিং হয়েছিল তো। ফ্র্যাকচারও হয়েছে অনেক জায়গায়।'

এবার টুকরো টুকরো এলোমেলো ভাবে অশোকের মনে পড়তে লাগল। কাল অনেক দিন বাদে এক রকম জোরজার করেই সে টালিগঞ্জের ব্যারাক বাড়িতে চলে গিয়েছিল। সেখানে রণেশ বল্টু ললিত এবং পাড়ার আরো তিরিশ চল্লিশটা বেকার ছেলের সঙ্গে চাকরি-বাকরির ব্যাপারে তার গোলমাল হয়েছিল। অবুঝ ইনকনসিডারেট ছোকরাগুলো বুঝতেই চায়নি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল হাউসের টপে গিয়ে বসলেই দুমদাম গণ্ডা গণ্ডা বেকারকে চাকরি দেওয়া যায় না। সেখানেও একটা সিস্টেম মেনে চলতে হয়। সে তো ডিক্টেটর নয়, অটোক্র্যাটের পাওয়ারও তার হাতে আসেনি। যা খুশি তা করার ক্ষমতা তার নেই। কিন্তু এ সব কথা শুনতেই চায়নি রণেশরা। ফলে তর্কাতর্কি এবং কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে যায় এবং উত্তেজিত মারমুখী যুবকেরা অকথ্য খিস্তি দিতে দিতে তার দিকে রাস্তার খোয়া ছুড়তে থাকে।

রণেশদের সম্পর্কে যথেষ্ট সহানুভূতিই রয়েছে অশোকের। অর্থনীতিক দিক থেকে তারা প্রায় হিউম্যান স্টেজেই পড়ে আছে। ওদের টেনে হিঁচড়ে মোটামুটি একটা ভদ্র লেভেলে তুলবার

জন্যই তো তার ঐ সুবিশাল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল হাউসে যাওয়া। কিন্তু বহু কাল ধরে যে সিস্টেম অনড় হয়ে আছে তা বদলাতেও তো খানিকটা সময় লাগে। তার জন্য নানা রকম স্ট্র্যাটেজি নিতে হবে। যত দিন না সিস্টেমটা পাল্টাচ্ছে, একটু ধৈর্য ধরা তো দরকার। খানিকটা সময়ও অশোককে দিতে হবে।

যে রণেশদের সম্পর্কে সে এত ভাবে তারাই তাকে ওভাবে মারল। এখনও যেন বিশ্বাস হতে চায় না অশোকের। তার দুর্বল মস্তিষ্কের ভেতরটা কেমন যেন ঝাপসা হয়ে আসতে থাকে।

এদিকে নার্সটা ফ্লাওয়ার ভাসের রজনীগন্ধা বদলে লাল গোলাপ রেখে আবার অশোকের কাছে ফিরে এসেছে। একটা নীল উর্দি পরা সুইপারও ঘরে ঢুকে কার্পেট এবং বাথরুম সাফ করে চলে গেল।

নার্স বলল, 'স্যার, এবার মুখটা ধুয়ে নিন। আমি হেল্প করছি—' বলেই বেডের কাছে জল, ব্রাশ-পেস্ট, তোয়ালে-টোয়ালে নিয়ে এলো।

অশোক জিজ্ঞেস করল, 'এটা কোন্ জায়গা ?'

কলকাতার একটা বিখ্যাত নার্সিং হোমের নাম করল নার্স।

তাই হবে। এই ঘরটা নিশ্চয়ই দামী পেসেন্টদের জন্য নির্দিষ্ট কেবিন। কাল চন্দ্রকান্ত রাহেজা তাকে টালিগঞ্জের সেই গলিটা থেকে উদ্ধার করে আনতে আনতে নার্সিং হোমে ভর্তি করার কথা বলেছিলেন। যাই হোক, অশোক আর কোন প্রশ্ন করল না।

নিঃশব্দে এবং যান্ত্রিক দক্ষতায় নার্স তার মুখ ধুতে এবং পোশাক বদলাতে সাহায্য করল। তারপর ধরে ধরে আর্ম চেয়ারে শুইয়ে একটা কেবিন বয়কে ডেকে এনে বালিশ, বেডশীট, ব্ল্যাঙ্কেট পাল্টে আবার তাকে বিছানায় নিয়ে এলো। মুখ ধোয়া, আর্ম চেয়ার পর্যন্ত নার্সের কাঁধে ভর দিয়ে যাওয়া এবং ফিরে আসা ইত্যাদি ধকলে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল অশোক। নার্স মেডিকেল ব্যাগ থেকে দ্রুত সিরিঞ্জ বার করে ইঞ্জেকসান দিয়ে দুটো ট্যাবলেট খাইয়ে দিল।

ইঞ্জেকসান এবং ট্যাবলেট ভালই কাজ করল। কয়েক মিনিটের ভেতর অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠল অশোক।

নার্স পাশে দাঁড়িয়ে ওষুধের রি-অ্যাকসান লক্ষ্য করছিল। এবার ক'পা গিয়ে ফোন তুলে কাকে যেন অশোকের জন্য ব্রেকফাস্ট দিয়ে যেতে বলল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বয় খাবারের ট্রলি ঠেলতে ঠেলতে এই কেবিনে এসে ঢুকল। অশোকের জন্য সবই প্রায় লিকুয়িড খাবার এসেছে। সঙ্গে অবশ্য ডিমের পোচ। নার্স চামচ দিয়ে পোচ কেটে কেটে অশোককে খাওয়াতে লাগল।

অন্যমনস্কর মতো খেতে খেতে একটা কথা বার বার মনে হতে লাগল অশোকের। নিজের মা-বাবার মুখ স্মৃতিতে ঝাপসা হয়ে গেছে, তাদের কথা বিশেষ মনেও নেই। তবে টালিগঞ্জের ব্যারাক বাড়িতে জীবনের পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত কম অসুখে তো সে ভোগেনি। টাইফয়েড, ডাইরিয়া, জণ্ডিস, নিমুনিয়া এবং আরো কত কি। যখনই তার কিছু হয়েছে, দেখেছে মাথার কাছে হয় মালতী কাকিমা নইলে রেখা বসে আছে। হরকাকা কত বার করে যে তার খবর নিয়ে গেছে, হিসেব নেই।

জীবনে এই প্রথম অসুস্থ শয্যাশায়ী অবস্থায় মালতী কাকিমা, রেখা বা হরকাকার বদলে একজন নার্স তাকে ওষুধ দিচ্ছে, খাবার খাওয়াচ্ছে। সৈনিক পেসিমিস্ট আশাক টের পেতে লাগল, ভেতরে ভেতরে সে ভয়ানক সেন্টিমেণ্টাল হয়ে পড়ছে। খোয়ার চোট লাগার পর তার নার্ভগুলো কি দুর্বল হয়ে যাচ্ছে? নিজের অজান্তেই তার চোখ দুটো জলে ভরে উঠতে থাকে।

নার্স আস্তে করে ডাকে, 'স্যার—'

পাছে এক অচেনা যুবতীর কাছে চোখের জল ধরা পড়ে সেজন্য সোজা তাকায় না অশোক, মুখটা সামান্য কাত করে বলে, 'আমাকে কিছু বলবেন সিস্টার?'

'হ্যাঁ। আপনার ক'টা মেসেজ আছে।'

'কী মেসেজ?'

'ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট সোমদেব চ্যাটার্জি কাল রাতে অনেক বার আপনার

খবর নিয়েছেন।'

'কালই আমাকে জানান নি কেন?'

'অতটা ইনজুরি হয়েছে। আপনাকে কাল সিডেটিভ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছিল। তা ছাড়া মিস্টার চ্যাটার্জির স্ট্রিক্ট ইনস্ট্রাকসন ছিল, আপনি মোটামুটি সুস্থ না হলে যেন তাঁর কথা না বলা হয়।'

'এবার মেসেজের কথাটা বলুন।'

'মিস্টার চ্যাটার্জি বলেছেন, খুব তাড়াতাড়ি আপনি সুস্থ হয়ে উঠুন।'

সোমদেবের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন ভরে যায় অশোকের। সে বলে, 'আবার যদি উনি ফোন করেন, লাইনটা আমাকে দেবেন।'

নার্স বলল, 'নিশ্চয়ই স্যার।'

'আর কার কী মেসেজ আছে?'

'মিস লীনা দেশাই নামে এক ভদ্রমহিলা আপনার আরোগ্য কামনা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, দু-একদিনের মধ্যে আপনাকে দেখতে আসবেন।'

'মিস দেশাই যদি ফোন করেন, আমাকে দেবেন।'

'অবশ্যই স্যার।'

এরপর আরো কয়েক জন ফোরমোস্ট ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, বিজনেস ম্যাগনেট এবং অশোকদের ইণ্ডাস্ট্রিয়াল হাউসের নানা ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট আর সেক্রেটারির নাম করে নার্স জানায়, এঁরাও তাঁর দ্রুত নিরাময় কামনা করেছেন।

এই সব বিখ্যাত ব্যস্ত মানুষ, যাঁদের হাতের মুঠোয় রয়েছে গোটা দেশের আর্থিক ভাগ্য, যাঁদের প্রতিটি মুহূর্ত অত্যন্ত মূল্যবান—ক'দিনই বা এঁদের সঙ্গে তার পরিচয়, তবু হাজার ব্যস্ততার মধ্যেও এই দামী মানুষেরা সময় করে তার খোঁজ নিয়েছেন। অথচ জ্ঞান হবার পর চোখ মেলে যাদের দেখলে বুক ভরে যেত তারাই শুধু কোন খবর নেয়নি। নার্সিং হোমের বিছানায় শুয়ে শুয়ে সীনিক ও পেসিমিস্ট অশোক এখন বড় সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়ে এবং এক ধরনের শূন্যতা অনুভব করতে থাকে। রেখা, মালতী কাকিমা, হরকাকা—সবাই তাকে দূরে, আরো

উঠল, 'নার্সিং হোমের লোকেদের দোষ নেই। তোমাদের ময়লা বাজে জামাকাপড় দেখে তোমরা অত বড় ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের আত্মীয় বলে ওদের বিশ্বাস হয়নি।'

কথাটার মধ্যে তীক্ষ্ণ একটা খোঁচা ছিল। অশোক চমকে রেখার দিকে তাকাল। তারপর আস্তে আস্তে মুখটা মালতীর দিকে ফিরিয়ে বলল, নার্সিং হোমের অফিসে বলে দিয়েছি, এখন তোমাদের কেউ আটকাবে না।'

'তাই তো দেখলাম। কালিঘাটে পুজো দিয়ে ভাবলাম তোর মাথায় মায়ের ফুল বেলপাতা ছুঁইয়ে যাব না? ভয় হল, যদি কালকের মতো আজও ঢুকতে না দেয়। রেখা সাহস দিল, বলল, 'চলই না, আজ ঢুকতে না দিলে তুলকালাম কাণ্ড করে ছাড়ব। কিছুই করতে হল না। আমাদের দেখেই এখানকার লোকেরা খাতির করে ওপরে নিয়ে এল। এখন বুঝতে পারছি তুই বলে রেখেছিলি।'

অশোক কিছু বলল না।

মালতী ফের বলল, 'জানিস অশোক, কাল এখান থেকে যাবার পর বাকী রাত রেখারা আর আমরা ঘুমোতে পারি নি। মা কালীকে খালি ডেকেছি, মাগো, ছেলেটাকে তাড়াতাড়ি ভাল করে দাও।'

একটু চুপ। তারপর অশোক যমুনা, শ্যামলী আর সোনার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলে। তারা কেমন আছে, কী রকম পড়াশোনা চলছে, ইত্যাদি ইত্যাদি নানা খবর খুঁটিয়ে জেনে নেয়। ফ্লোর বয়কে ডাকিয়ে সবার জন্য কিছু খাবার-দাবার আনিয়ে দেয়। শ্যামলীদের সঙ্গে কথাবার্তার ফাঁকে হঠাৎ অশোকের খেয়াল হয়, রেখা বড় বেশি চুপচাপ। খোঁচা দিয়ে একবার কথা বলা ছাড়া সে আর মুখ খোলে নি। রেখার দিকে ফিরে অশোক বলে, 'আমরা সবাই কথা বলছি। তুমি একেবারে স্পীকটি নট। ব্যাপার কী?'

রেখা আস্তে করে বলে, 'আমি তো কথা বলার জন্যে আসি নি। তোমাকে দেখতে এসেছি।'

'দেখতে এলে মানুষ বুঝি কথা বলে না। কাকীমার মতো

জিজ্ঞেসও তো করতে পারতে, আমি কেমন আছি।' হাতের ভর দিয়ে এধারে কাত হয়ে শোয় অশোক।

রেখা অবাক চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর বলে, 'আশ্চর্য।'

'কীসের আশ্চর্য।'

'তুমি তো আগে এ রকম ভ্যাদভেদে সেন্টিমেণ্টাল কথা বলতে না। অ্যাফ্লুয়েন্ট সোসাইটিতে ঢুকে একেবারে বদলে গেছ।'

অশোকের চমক লাগে। সে বলে, 'আমারই ধারণা ছিল হ্যাভ-নটদের মধ্যেই ইমোসানের ব্যাপারগুলো বেশি কাজ করে। সেন্টিমেণ্টের গ্ল্যাণ্ডগুলো অ্যাফ্লুয়েন্ট সোসাইটির লোকেরাই কেটে উড়িয়ে দেয়।'

অশোকের কথার উত্তর না দিয়ে রেখা বলে, 'তোমাকে দেখে বুঝলাম ভাল আছ, তাই আর জিজ্ঞেস করি নি।'

'চোখ আর মুখ, দুটোকে একসঙ্গে খাটিয়ে লাভ নেই—না কি বল ?'

রেখা কিছু বলল না।

আচমকা কী মনে পড়তে অশোক দ্রুত মালতীর দিকে ফিরল। বলল, 'আচ্ছা কাকীমা—'

মালতী বলল, 'কী রে ?'

'তোমরা এলে, কাকাকে দেখছি না তো ? আমি নার্সিং হোমে পড়ে আছি। কাকা আমাকে একবার দেখতে আসতে পারল না।' নিজের অজান্তেই গলার স্বর ভারী হয়ে আসতে থাকে অশোকের। আজ তার মধ্যে ক্রমাগত কী যেন ঘটে যাচ্ছে। বার বার ইমোসানাল হয়ে পড়ছে সে।

মালতী বলল, 'কাল রাত্তিরে এসেছিল তো। কিন্তু আজ—'

'আজ কী ?'

'আজ ওদের হেড অফিসে কী একটা যেন আছে। ওদের কোম্পানিতে যেখানে যত লোক কাজ করে সবাই—'

মালতীর কথা শেষ হবার আগেই রেখা বলে উঠল, 'আঃ কাকীমা,

তোমাকে না ওসব বলতে বারণ করা আছে।'

সঙ্গে সঙ্গে মালতী থেমে গেল। বিব্রত মুখে বলল, 'না না, তেমন কিছু না।'

মাথার ভেতরটা এখনও বেশ দুর্বল। অশোক ভাবতে চেষ্টা করল, হেড অফিসে সীরিয়াস কিছু ঘটার ব্যাপার আছে কি আজ? এই মুহূর্তে কিছুই করতে পারল না সে। মালতীকে জিজ্ঞেস করল, 'হেড অফিসে কী হয়েছে কাকীমা? বলতে বলতে থেমে গেলে কেন?'

মালতী বিপন্নভাবে রেখার দিকে তাকাল।

অশোক বুঝতে পারছে, তাদের অগুনতি কোম্পানির হেড-কোয়ার্টারে এমন কিছু একটা ঘটেছে যা ফেলে হরনাথের পক্ষে নার্সিং হোমে ছুটে আসা সম্ভব হয় নি। যা-ই ঘটুক, রেখা তাকে তা জানতে দিতে চায় না। সে জন্য মালতী কাকীমাকে শিখিয়ে পড়িয়েও এনেছিল, কিন্তু সাদাসিধে সরল ধরনের মানুষ মালতী কাকীমা অত ঘোরপ্যাচ জানে না। ঝোঁকের মাথায় সে প্রায় বলতেই যাচ্ছিল। রেখা থামিয়ে না দিলে সবটাই বলত।

অত বড় ইণ্ডাস্ট্রিয়াল হাউসের টপমোস্ট পার্সন হল অশোক। তার অজান্তে হেড-কোয়ার্টারে কী এমন ঘটতে পারে। কিছুতেই ভেবে ওঠা যাচ্ছে না। অশোক মালতীকে লক্ষ্য করতে করতে বলল, 'রেখার দিকে তাকাতে হবে না, তুমি আমার দিকে তাকিয়ে বল।'

ভয়ে ভয়ে মালতী জিজ্ঞেস করে, 'কী বলব?'

'হেড অফিসে কী গোলমাল হয়েছে আমাকে বল। তুমি তো জানো, হরকাকার কোম্পানির আমি চেয়ারম্যান, মানে কর্তা। আমার সব জানা দরকার।'

মালতী ফের রেখার দিকে তাকাতে যাচ্ছিল, অশোক ধমক লাগাল, 'ওদিকে ফিরতে হবে না, স্ট্রেট আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকো। বল এবার।'

মালতী ভয়ানক নার্ভাস হয়ে যায়। সে কী বলবে, ভেবে উঠতে

পারছে না যেন।

অশোক জানে, মালতী বানিয়ে মিথ্যে বলতে শেখে নি। সে তাড়া লাগায়, 'কী হল, চুপ করে রইলে কেন?'

মালতী ভীতু গলায় বলে, 'আমাকে এ নিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করিস নি বাপু। যা জানবার রেখা আর তোর কাকার কাছেই জেনে নিস। আমি কী বলতে কী বলব, ওরা রেগে যাবে, বকাবকি করবে।'

অশোক জানে, রেখার মুখ থেকে এ ব্যাপারে একটি শব্দও বার করা যাবে না। সে বলে, 'ঠিক আছে, তোমরা না বললেও আমি একটু পরেই সব জেনে নিচ্ছি।'

কেবিনটার মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য আশ্চর্য স্তব্ধতা নেমে এল।

এক সময় মালতী বলল, 'অনেক বেলা হল, এবার যাই রে অশোক। গিয়ে আবার রান্নাবান্না আছে। বিকেলে আবার আসব।'

মালতীরা উঠতে যাবে, অশোক বলল, 'একটু বসে যাও কাকীমা, তোমাদের গাড়ির ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।' নার্সকে ডেকে বলল, 'আমার বাড়িতে ফোন করে মিস্টার রাহেজাকে বলুন—'

রেখা হঠাৎ বলে উঠল, 'ফোন করতে হবে না।'

অশোক অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কেন?'

'পাড়ার ছেলেরা কাল যার লিমুজিন ভেঙেছে, আজ যদি তারই গাড়িতে করে বাড়ি ফিরি কী অবস্থা হবে ভাবতে পারো? আমরা স্টেট ট্রান্সপোর্টের বাসে ভীড়ে গাদাগাদি করেই যাব। সেটাই আমাদের ইটারন্যাল অভ্যাস।'

'তুমি কী বলতে চাও?'

রেখা বলে, 'তা বোঝা কি এতই শক্ত?'

একদৃষ্টে রেখার দিকে তাকিয়ে অশোক বলল, 'পাড়ার ছেলেরা আমাকে অন্য একটা ক্লাসে ফেলে দিয়েছে। আমার সঙ্গে তোমরা নিজেদের জড়াতে চাও না, এই তো?'

রেখা উত্তর দিল না।

অশোক আবার বলে, 'আমার অপরাধটা কী? বাই চান্স আমি

অ্যাফ্লুয়েন্সের মধ্যে এসে পড়েছি—সেটাই কী?'

রেখা বলল, 'তা বলতে পারো।'

'আমি কী জন্যে ওখানে গেছি, তোমাদের কম করে পাঁচশো বার বলেছি।'

'নিশ্চয়ই বলেছ।'

'তবু সন্দেহটা যাচ্ছে না?'

রেখা চুপ করে থাকে।

অশোক বলে, 'আমার সঙ্গে তোমরা কি রিলেশানটা কাট-অফ করে দিতে চাও?'

'তাই যদি চাইতাম, তোমাকে দেখতে এলাম কেন? তবে—'

'তবে কী?'

একটু কী ভেবে রেখা বলে, 'না, এখন থাক। আরো কিছুদিন তোমাকে দেখি, তারপর বলব।'

'কী বলবে রেখা?' বলে অশোক। কিন্তু সে জানে, হাজার চেষ্টা করলেও এখন আর সেটা জানা যাবে না, অজানাই থেকে যাবে। রেখা যখন বলেছে পরে বলবে তখন অপেক্ষা করতেই হবে।

রেখা ফের বলল, 'আমরা এবার যাই।' বলতে বলতে চেয়ার থেকে উঠে পড়ল। দেখাদেখি মালতী কাকীমারাও উঠে দাঁড়াল।

অশোক গাড়িতে করে টালিগঞ্জের ব্যারাক বাড়িতে ওদের পৌঁছে দেবার কথা আর বলল না। বিশাল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এম্পায়ারে সে আসার পর থেকেই অদ্ভুত এক কমপ্লেক্সে ভুগতে শুরু করেছে রেখা। কমপ্লেক্সটা কী করে ঘোচাবে, অশোক ভেবে পায় না। সে জানে, তাড়াহুড়ো করে কোন লাভ নেই। যা দরকার তা হল সময় এবং ধৈর্য। দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত কী হয়।

মালতী কাকীমারা একটু পর চলে যায়।

কেবিনটা ফাঁকা হয়ে গেলে হঠাৎ অফিসের ব্যাপারটা আবার মনে পড়ে গেল অশোকের। কী হতে পারে সেখানে? সে ঠিক করল, অফিসে ফোন করে জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে এ নিয়ে কথা

বলবে। নার্সকে লাইনটা দিতে বলবে, সেই সময় হঠাৎ ফোন এলো।

নার্স লাইনটা ধরেছিল। কার সঙ্গে যেন কথা বলে মাউথ-পীসটায় হাত চাপা দিয়ে অশোকের দিকে ফিরল সে, 'স্যার আপনার ফোন।'

অশোক জিজ্ঞেস করল, 'কে?'

'মিস্টার সোমদেব চ্যাটার্জি।'

অশোক ব্যস্ত হয়ে উঠল। বলল, 'দিন।'

নার্স টেলিফোনটা অশোকের মাথার কাছে একটা উঁচু স্ট্যাণ্ডে রেখে রিসিভারটা তার হাতে দিল।

অশোক 'হ্যালো' বলতেই ওধার থেকে সোমদেবের গম্ভীর গলা ভেসে এলো, 'গুড মর্ণিং অশোক।'

অশোক বলল, 'গুড মর্ণিং মিস্টার চ্যাটার্জি।'

'তুমি কাল তো ভীষণ চিন্তায় ফেলে দিয়েছিলে। এখন কেমন আছ বল—'

'অনেক ভাল। আমি শুনেছি, আপনি আগেও আমার খবর নিয়েছেন। অনেক ধন্যবাদ।'

'ধন্যবাদ আবার কীসের এটা তো আমার কর্তব্য। এনিওয়ে, পারমিতা তোমার সঙ্গে একটু কথা বলবে। কথা হয়ে গেলে লাইন ছেড়ে দিও না। একটা বিষয়ে সামান্য একটু আলোচনা আছে।'

পারমিতা অশোকের শরীর সম্পর্কে খোঁজ খবর নিলেন এবং তার দ্রুত আরোগ্য কামনা করলেন। অশোক তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আবার সোমদেবের সঙ্গে কথা বলতে থাকে।

সোমদেব বলেন, 'আমরা একটা ডিসিসান নিয়েছি। এখন তুমি যদি রাজি থাক—'

অশোক জিজ্ঞেস করে, 'কিসের ডিসিসান?'

'তোমাকে কাল-বস্তির যে র‍্যাফায়েনগুলো ওভাবে মারল তাদের ছাড়া হবে না।'

'কী করতে চান আপনারা?'

'ওদের একটা ভাল লেসন দেওয়া দরকার।'

'কী রকম?'

'লালবাজারে খবর দিলে পুলিশ গিয়ে গোটা এরীয়া কর্ডন করে বদমাসগুলোকে তুলে আনবে। তারপর ল আর কোর্ট তার কাজ করবে।' বলে একটু থামেন সোমদেব। পরক্ষণেই আবার শুরু করেন, 'কালই সবাই পুলিশ পাঠাতে চেয়েছিল। তোমার তখন সেন্স ছিল না, তাই আমি ওদের আটকে রেখেছি। তোমার কনসেণ্ট ছাড়া এটা করা ঠিক নয়। আফটার অল্, তুমি তো ওখান থেকেই এসেছ। ওখানকার ব্যাকগ্রাউণ্ডটা তো তোমার মধ্যে কাজ করছে।'

অশোক চমকে ওঠে। বলে, 'না না, প্লীজ ওদের পিছনে পুলিশ লাগাবেন না। এ ব্যাপারে আমার একদম কনসেণ্ট নেই।'

সোমদেব বলল, 'তুমি একটু ভেবে বল।'

'ভেবেই বলছি।'

'এই হুলিগ্যানিজমকে কোন ভাবেই এনকারেজ করা উচিত না।'

'আমাদের পাড়ার ছেলেরা হুলিগ্যান নয়।'

'হুলিগ্যান বজ্জাত না হলে এ ভাবে কেউ মারতে পারে!'

অশোক বলে, 'ওরা আমাকে কেন মেরেছে সেটা আপনি বুঝবেন না।'

সোমদেব বললেন, 'বুঝিয়ে দিলে কেন বুঝব না?'

'তার কারণ আপনি ওদের ক্লাসের লোক নন। ওদের লেভেলে না থাকলে ওদের অ্যাটিচুড বোঝা যাবে না।'

'তুমি তো ওদের লেভেলে বা ক্লাসে এখন নেই। তুমি বুঝতে পারলে আমি বুঝব না কেন?'

'আমি ওদের ক্লাসে বা লেভেলে নেই, আপনাকে কে বলল? আই ভেরি মাচ বিলং টু ছাট ক্লাস।' অশোকের গলার স্বর কিছুটা রুক্ষ শোনায়। সে বলতে থাকে, 'ওদের জন্যেই আপনাদের ওয়ার্ল্ডে আমাকে আসতে হয়েছে। এটা আপনি খুব ভাল করেই জানেন।'

সোমদেব বললেন, 'আই অ্যাম স্যরি।'

'আপনার নিশ্চয়ই একটা কথা মনে আছে—'

'কী?'

অশোক বলল, 'বার বার আপনি বলেছেন, আমি যেন নিজের ক্লাস ক্যারেক্টার নষ্ট না করে ফেলি।'

সোমদেব ব্যস্তভাবে বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়ছে।'

'আপনাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি, নিজের শ্রেণীচরিত্র সম্পর্কে আমি সারাক্ষণ কনসাস। আরো কমফোর্ট আরো অ্যাফ্লুয়েন্স দিয়ে যদি আমাকে মুড়েও দেন, ওটা আমি ভুলছি না।'

একটু চুপ করে থেকে সোমদেব বললেন, 'ভেরি গুড। তোমার সম্বন্ধে আমার ধারণাটা ভুল হয়েছিল। আই উইথড্র ইট।'

অশোক উত্তর দিল না।

সোমদেব এবার বললেন, 'তা হলে টালিগঞ্জের ঐ ছেলেগুলোর এগেনস্টে পুলিশ অ্যাকসান নেওয়া হবে না তো?'

'না। ওদের ব্যাপারে আপনাদের ভাবতে হবে না। যা ভাববার আমি ভাবব।'

'ঠিক আছে। তবু আমি একটা কথা বলব।'

'কী কথা?'

'টালিগঞ্জের ঐ স্লাম এরীয়ায় তুমি আর একা একা যেও না। গেলেও পুলিশ প্রোটেকসান নিয়ে যাবে।'

'আপনার অ্যাডভাইসের জন্যে ধন্যবাদ। তবে আমি কী করব না করব, সেটা আমার ওপরেই ছেড়ে দিন।'

খানিকটা যেন হকচকিয়ে গেলেন সোমদেব। তারপর বললেন, 'ও, আচ্ছা। অনেকক্ষণ কথা বলেছ, নিশ্চয়ই স্ট্রেন হচ্ছে। আর তোমাকে কথা বলানো ঠিক হবে না। পরে আবার ফোন করব।'

সোমদেব লাইনটা কাটতে যাবেন, সেই কথাটা আবার মনে পড়ে গেল। অশোক দ্রুত বলে উঠল, 'মিস্টার চ্যাটার্জি, এক মিনিট, প্লীজ—'

'কিছু বলবে?'

'হ্যাঁ। হেড অফিসে কি কিছু ডিস্টারব্যান্স-ট্যান্স হয়েছে?'

তক্ষুণি উত্তর দিলেন না সোমদেব। কিছুক্ষণ বাদে আস্তে করে বললেন, 'যা হয়েছে তাতে ভাবনার কিছু নেই। এখন তাড়াতাড়ি তুমি সুস্থ হয়ে ওঠ।'

অশোককে আর কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে লাইন কেটে দিলেন সোমদেব।

ক্রেডেলে টেলিফোনটা রাখতে রাখতে অশোকের মনে হতে লাগল নিশ্চয়ই মারাত্মক কোন ব্যাপার ঘটেছে। নইলে হট করে ফোন কেটে দেবেন কেন সোমদেব। আর হরকাকাই বা নার্সিং হোমে না এসে হেড অফিসে ছুটবে কেন ?

অশোক একবার ভাবল, নার্সকে অফিসের লাইনটা ধরে দিতে বলবে। কিন্তু এতক্ষণ অনবরত মালতী কাকীমাদের আর সোমদেবের সঙ্গে কথা বলে মাথার ভেতরটা ঝিমঝিম করছে। ক্লান্তি এবং দুর্বলতায় শরীর ভেঙে আসছে যেন। অশোক ঠিক করল, এখন না, পরে এ ব্যাপারে খোঁজখবর নেওয়া যাবে।

দশ

দুপুরে একটানা ঘণ্টা তিনেক ঘুম হয়েছিল। বিকেলে অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠল অশোক। অফিসের কথাটা সে ভোলে নি। নার্সকে দিয়ে সেখানে কানেকসান করিয়ে প্রথমে কোম্পানির হাই-পাওয়ার কমিটির ডাইরেক্টরদের ধরতে লাগল।

সবাইকে অবশ্য পাওয়া গেল না। তবে কার্সেটজি বিলিমোরিয়া এবং ব্রিজলাল আগরওয়ালা অফিসেই ছিলেন। টেলিফোনে অশোকের গলা শুনে তাঁরা রীতিমত অবাক। ভীষণ উদ্বেগের গলায় তার শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে খুঁটিনাটি নানা খবর নিলেন।

দু-এক কথায় নিজের সুস্থতা সম্পর্কে ওঁদের নিশ্চিন্ত করে এবং প্রচুর ধন্যবাদ জানিয়ে অশোক বলল, 'আপনাদের কাছে একটা

ইনফরমেসন চাই।'

'অবশ্যই।'

'শুনলাম হেড অফিসে গোলমাল হয়েছে।'

বিলিমোরিয়া বা আগরওয়ালা যা জানালেন, সংক্ষেপে এই রকম। ছোটখাটো ইনসিডেণ্ট একটা হয়েছে। সামান্য লেবার আনরেস্ট। চিরকালই ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্ল্ডে এই রকম ঘটে থাকে। দিস ইজ পার্ট অফ দা গেম। নাথিং টু ওরি অ্যাবাউট। দুর্ভাবনা বা উদ্বেগের কোন কারণ নেই।

অবিকল সোমদেব চ্যাটার্জির মতোই বিলিমোরিয়া এবং আগরওয়ালা ব্যাপারটা এড়িয়ে গেলেন।

আসল ব্যাপারটা কেউ তাকে জানাতে চাইছে না কেন? অশোক ভেতরে ভেতরে ভয়ানক অসহিষ্ণু এবং উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগল। একবার সে ভাবল, পার্সোনেল ম্যানেজার বা জি-এমকে ফোন করবে কিনা। পর মুহূর্তেই তার মনে হল, তারাও হয়তো সঠিক খবরটা দেবে না।

কী করা উচিত, অশোক যখন ভেবে উঠতে পারছে না, ঠিক সেই সময় রাহেজা কেবিনে এসে ঢুকলেন। বেডের কাছে এসে যান্ত্রিক নরম গলায় তার শরীরের চোট-টোট সম্পর্কে নতুন করে খোঁজ নিতে লাগলেন।

একটি কথারও উত্তর না দিয়ে অশোক সোজা রাহেজার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি আপনার কাছে একটা কারেক্ট ইনফরমেসন পেতে চাই। আশা করি, অ্যাভয়েড করতে চেষ্টা করবেন না। হাইড অ্যাণ্ড সীক ব্যাপারটা আমি একেবারেই পছন্দ করি না।'

রাহেজার মতো স্মার্ট ঝানু প্রাইভেট সেক্রেটারিও হকচকিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'কী ইনফরমেসন জানতে চান স্যার?'

'আমাদের হেড অফিসে আজ কী হয়েছে?'

রাহেজা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলেন না। অত্যন্ত বিনীতভাবে বললেন, 'সেটা বলা ঠিক হবে না স্যার।'

অশোক অবাক হয়ে বলল, 'কেন ?'

'ডাক্তারদের বারণ আছে। চ্যাটার্জি সাহেব, আগরওয়ালা সাহেব, বিলিমোরিয়া সাহেব, সান্ধু সাহেব—সবাই বলে দিয়েছেন আপনাকে যেন অফিসের ব্যাপারে কিছু না জানাই।'

অশোক অসহিষ্ণু হয়ে উঠল, 'কারণটা কী ?'

'ওঁরা বলেছেন, এক্সাইটমেণ্ট বাড়ে এমন কোন খবর এখন আপনাকে দেওয়া ঠিক হবে না।' বলে ভয়ে ভয়ে অশোকের দিকে তাকালেন রাহেজা।

অশোক এবার প্রায় ক্ষেপেই গেল, রুক্ষ গলায় বলল, 'খবরটা না দেবার জন্যেই আমার এক্সাইটমেণ্টটা কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে রাহেজা সাহেব।'

বিপন্ন মুখে রাহেজা বললেন, 'আপনার নার্ভের ওপর কিন্তু স্ট্রেন পড়বে স্যার।'

'আমার নার্ভ খুব উইক নয় মিস্টার রাহেজা। আপনি বলে যান।'

রাহেজা দ্বিধান্বিতের মতো দাঁড়িয়ে থাকলেন। অফিসের ব্যাপার বলা ঠিক হবে কিনা তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না।

অশোক তীক্ষ্ণ চাপা গলায় বলল, 'মিস্টার রাহেজা, আমি আপনাদের হাউসের টপমোস্ট পার্সন। সেই ক্যাপাসিটিতে আমার একজন সাবঅর্ডিনেটকে অর্ডার দিচ্ছি। আশা করি, ইন-সাবঅর্ডি-নেসনের ধৃষ্টতা দেখাবেন না।'

রাহেজা চমকে উঠলেন। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্ল্ডে তিনি একজন অভিজ্ঞ ভেটারেন মানুষ। বিরাট বিরাট বিজনেস ম্যাগনেট আর টাইকুনদের প্রাইভেট সেক্রেটারি হিসেবে কম করে পঁচিশ বছর কাজ করছেন। বাইরে যথেষ্ট পরিমাণে বিনয় এবং মেকানিক্যাল আনুগত্য দেখালেও ভেতরে ভেতরে বস্তির এক অনভিজ্ঞ যুবক সম্বন্ধে তিনি খানিকটা অবজ্ঞাই পোষণ করে থাকেন। অশোকের মধ্যে অনমনীয়

একগুঁয়ে জেদী একটি প্রবল মানুষ যে থাকতে পারে, এতটা তিনি ভাবতে পারেন নি। প্রায় ঢোঁক গিলেই রাহেজা শুরু করলেন, 'স্যার, আমাদের সবগুলো ফ্যাক্টরি আর অফিসে লাগাতার ধর্মঘট মানে কন্টিনিউয়াস স্ট্রাইক শুরু হয়েছে। কাল সকাল থেকে হাজার হাজার ফ্যাক্টরি ওয়ার্কার আর এমপ্লয়ী হেড অফিসের সামনে পিকেটিং শুরু করেছে।'

অশোক চমকে উঠল। বলল, 'কোন্ কোন্ ইউনিয়ন এই স্ট্রাইক কল করেছে?'

'সবগুলো ইউনিয়ন।'

অশোকের এবার মনে হল, এই কারণেই হরনাথ আজ নার্সিং হোমে আসে নি, অন্য সব এমপ্লয়ীর সঙ্গে হেড অফিস ঘেরাও করে বসে আছে। পাছে উত্তেজনা বেড়ে তার ক্ষতবিক্ষত দুর্বল শরীরের নার্ভ-গুলো বিপর্যস্ত হয়, সেই জন্য ডাক্তার থেকে শুরু করে রেখা পর্যন্ত কেউ হেড অফিসের মারাত্মক ঘটনার কথা তাকে জানাতে চায় নি।

অশোকের আবছাভাবে মনে পড়ল, ক'দিন আগে হাই-পাওয়ার কমিটিতে কী একটা বিষয় নিয়ে ডাইরেক্টরদের সঙ্গে তার কিছুটা তর্কাতর্কি হয়। বিষয়টা-কী, এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। তবে তখনই বোঝা গিয়েছিল, খুব শিগগিরই হাউসে বিরাট আকারে একটা লেবার আনরেস্ট আসছে। অশোক জিজ্ঞেস করল, 'ইউনিয়নগুলো কী জন্যে স্ট্রাইক ডেকেছে, আপনি জানেন?'

রাহেজা বললেন, 'জানি স্যার। হেড অফিসে কম্পিউটার বসাবার প্রোটেস্টে। এমপ্লয়ীদের ধারণা এতে প্রচুর লোক ছাঁটাই হবে। এটা শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী কাজ।'

অশোকের আরেক বার চমক লাগল। সে বলল, 'কম্পিউটার এসে গেছে নাকি?'

'হ্যাঁ স্যার। কাল বিকেলে এসেছে। মেশিনগুলো তুলে অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, সেই সময় ওয়াচ অ্যাণ্ড ওয়ার্ডের লোকদের চোখে পড়ে যায়। তারা ইউনিয়নকে খবর দেয়।

ইউনিয়ন সঙ্গে সঙ্গে স্ট্রাইকের ডাক দেয়।'

অশোক ভাবল, কাল ছিল রবিবার, ছুটির দিন। হেড অফিসের বিশাল মালটিস্টোরিড বিল্ডিংটা একেবারে ছিল ফাঁকা। এই সুযোগে কম্পিউটার মেশিনগুলো চুপিসারে বসাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল কিন্তু শেষরক্ষা করা যায় নি।

অশোক জিজ্ঞেস করল, 'কে কম্পিউটার বসাবাব ব্যবস্থা করেছে? কার অর্ডারে এ সব হচ্ছিল?'

'আমি বলতে পারব না স্যার।' রাহেজাকে কিছুটা নার্ভাস দেখায়।

অশোক বলে, 'আমি এই হাউসের টপ ম্যান। লুকিয়ে লুকিয়ে এ রকম একটা ব্যাপার ঘটানো হতে যাচ্ছিল, অথচ কেউ আমাকে কিছু জানানো প্রয়োজন মনে করে নি। দিস ইজ রীয়ালি স্ট্রেঞ্জ!'

রাহেজা চুপ করে রইলেন। অশোকের কথার উত্তর দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

অশোক ফের বলল, 'আমি এ জন্যে এক্সপ্লেনেসন চাইব। এর জন্যে যে বা যারা দায়ী তাদের কাউকে ছাড়ব না। নো, নেভার। হেড অফ দি হাউসকে না জানিয়ে এ রকম একটা ডিসিসান নেওয়া খুবই মারাত্মক ব্যাপার।'

রাহেজা এবারও উত্তর দিলেন না।

একটু চুপচাপ।

তারপর অশোক বলে উঠল, 'মিস্টার রাহেজা, আমি আর এক সেকেণ্ডও নার্সিং হোমে থাকতে চাই না। আজই আমার বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা করুন। কালই আমি অফিস অ্যাটেণ্ড করব।'

রাহেজা ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়লেন। বললেন, 'এ অবস্থায় আপনার বাড়ি ফেরা ঠিক হবে না স্যার। মেডিক্যাল বোর্ড আপনাকে দশ দিন ফুল রেস্ট নিতে অ্যাডভাইস করেছে।'

'আমি কোন অ্যাডভাইস শুনতে চাই না। আজই আমি বাড়ি ফিরব।'

'এখন নার্সিং হোম ছেড়ে যাওয়া আপনার পক্ষে খুবই ক্ষতিকর।'

'আমি কোলের বাচ্চা নই। যা বলছি তাই করুন।'

'ক্ষমা করবেন স্যার। সাব-অর্ডিনেসনের দায়ে আমাকে আপনি স্যাকও করতে পারেন কিন্তু এই রিস্ক আমার পক্ষে নেওয়া একেবারেই সম্ভব না। ডাক্তারদের ডেকে আনছি। তাঁরা যদি পারমিসান দেন তবেই বাড়ি নিয়ে যাব। আই অ্যাম হেল্পলেস স্যার।'

রাহেজার অসহায়তাটা কোথায়, অশোক বুঝতে পারল। একটু ভেবে সে বলল, 'ঠিক আছে, ডাক্তারদের খবর দিন। আমি তাঁদের সঙ্গে কথা বলে দেখছি।'

কিছুক্ষণ বাদে অশোকের জন্য নির্দিষ্ট মেডিকেল টীমের চারজন ডাক্তার কেবিনে এলে অশোক বলল, 'নার্সিং হোমে আমার পক্ষে থাকা সম্ভব নয়। কাইণ্ডলি আমার রিলিজ অর্ডার দিন। আপনারা ছেড়ে না দিলে আমার সেক্রেটারি আমাকে নিয়ে যেতে চাইছেন না।'

চারজন ডাক্তার একসঙ্গে হকচকিয়ে গেলেন। তাঁদের মধ্যে যিনি সীনিয়রমোস্ট অর্থাৎ ডক্টর তরফদার বললেন, 'সে কি, কাল সেন্সলেস হয়ে ছিলেন, আর আজই চলে যেতে চাইছেন! না না, দশ দিনের আগে কিছুতেই আপনাকে ছাড়তে পারব না।'

'আই অ্যাম অলরাইট নাউ।'

'আপনার তা মনে হচ্ছে। আমাদের ধারণা অন্যরকম। পারফেক্টলি কিওরড না হলে রিলিজ অর্ডার দেওয়া অসম্ভব।'

'এই নার্সিং হোমে থাকলে আমি আরো অসুস্থ হয়ে পড়ব। আমার টেনসন দশ গুণ বেড়ে যাবে।'

ডক্টর তরফদার বললেন, 'এখানে কি আপনার কোন অসুবিধা হচ্ছে? তা হলে—'

তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই অশোক বলে উঠল, 'নট অ্যাট অল। বরং এখানে এত কমফোর্ট যে সেটাই অস্বস্তির কারণ। আমি যেতে চাইছি অন্য কারণে। সেটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। দ্যাট -হ্যাজ গট নাথিং টু ডু উইথ ইওর নার্সিং হোম। বরং আপনারা

আমার জন্যে যা করেছেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।'

'কিন্তু স্যার, আপনাকে রিলিজ করে দেওয়াটা খুবই ঝুঁকির ব্যাপার হবে। আমরা আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী। এখান থেকে গিয়ে যদি কিছু হয়—'

ডাক্তারদের অসুবিধার ব্যাপারটা বুঝতে পারছিল অশোক। সে বলল, 'আপনাদের কোন রকম রিস্ক নিতে হবে না। মুচলেকায় সই করে আমি এখান থেকে বেরুব। লিখে দিয়ে যাব, আমার ভাল মন্দের জন্যে কেউ দায়ী নয়।'

খানিকটা চিন্তা করে ডাক্তার তরফদার বললেন, 'আপনি যা বললেন, তার ওপর কথা চলে না। তবে একটা অনুরোধ করব—'

'বলুন।'

'দয়া করে আজ আর যাবেন না। কাল যখন মনে হয়, যাবেন। অত বড় ইনজুরির পর অন্তত একটা ফুল ডে নার্সিং হোমে থাকুন।'

অশোক ভেবে দেখল, ডাক্তার তরফদারের অনুরোধটা মেনে নেওয়াই ভাল। আজ বেরিয়ে অফিসে গিয়ে কোন কাজ হবে না। বরং বাকী দিন এবং একটা রাত রেস্ট পেলে তার পক্ষে ভালই হবে। সে বলল, 'ঠিক আছে, কালই যাব।'

'আরেকটা কথা স্যার—'

'কী?'

'বেশ কিছুদিন আপনার ট্রিটমেন্ট দরকার।'

'ঠিক আছে। দরকার যখন, আপনারা গিয়ে রোজ আমাকে দেখে আসতে পারেন।'

'ধন্যবাদ স্যার।'

এগার

পরের দিন সকালে রাহেজা অশোককে ওল্ড বালিগঞ্জের বাড়িতে নিয়ে গেল।

রাস্তায় একটা কথাও বলেনি অশোক। লিফটে করে টপ ফ্লোরে নিজের বেডরুমে এসেই শুয়ে পড়ল সে। মাথার ভেতরটা ভয়ানক ঝিমঝিম করছে। গাড়ি থেকে নেমে সামান্য কয়েক গজ হেঁটে আসতেই মনে হচ্ছে হাত পায়ের জোড় যেন আলগা হয়ে যাচ্ছে। উত্তেজনা এবং ঝোঁকের মাথায় এ ভাবে তুম করে চলে আসা বোধ হয় ঠিক হয়নি।

রাহেজা অশোকের বিছানার কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন। অনেকটা ঝুঁকে উদ্বেগের গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'স্যার, শরীর কি খুব খারাপ লাগছে?'

অশোক উত্তর দিল না।

রাহেজা আবার বললেন, 'নার্সিং হোমে ডাক্তারদের খবর দিই?'

আস্তে করে দুর্বল গলায় অশোক এবার বলল, 'দরকার নেই। একটু রেস্ট নিতে পারলে সব ঠিক হয় যাবে।'

চোখ বুজে খানিকক্ষণ শুয়ে থাকার পর মাথার ঝিমঝিম ভাব এবং দুর্বলতা কিছুটা কেটে গেল। চিরকালই বালিশে মুখ গুঁজে উপুর হয়ে শোবার অভ্যাস তার। একটু সুস্থ হলে পাশ ফিরতেই অশোকের চোখে পড়ল, রাহেজা ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তাকেই লক্ষ্য করছেন।

চোখাচোখি হতেই রাহেজা জিজ্ঞেস করলেন, 'স্যার, এখন কীরকম ফীল করছেন?'

অশোক বলল, 'অনেক ভাল। হঠাৎ মাথাটা কেমন যেন করে উঠেছিল। বোধ হয় উইকনেসের জন্যে। নাউ আই অ্যাম পারফেক্টলি

অলরাইট।' একটু থেমে বলল, 'এবার কাজের কথায় আসা যাক। অফিসের খবর জানেন?'

রাহেজা বললেন, 'কাল সন্ধ্যে পর্যন্ত জানি, তখনও ওয়ার্কাররা অফিস ঘেরাও করে বসে ছিল। তারপর কী হয়েছে, বলতে পারব না স্যার—'

'অফিসের লাইন ধরে লেটেস্ট খবরটা জেনে নিন।'

ঘরের কোণে গিয়ে ডায়াল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হেড অফিসে কার সঙ্গে যেন কথা বলে এলেন রাহেজা। অশোককে জানালেন, 'অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। ওয়ার্কাররা এখনও সিট-ইন স্ট্রাইক করে বসে আছে।'

অশোক বলল, 'মিস্টার রাহেজা, আমি আরেকটু শুয়ে থাকি। সকালে উঠেই আপনি নার্সিং হোমে চলে গিয়েছিলেন। আপনি নীচে গিয়ে একটু রেস্ট নিন। দুপুরে আমি অফিসে যাব। আপনি ঠিক একটার সময় এখানে চলে আসবেন।'

বলা সত্ত্বেও রাহেজা গেলেন না, দ্বিধান্বিতের মত দাঁড়িয়ে রইলেন।

অশোক জিজ্ঞেস করল, 'কিছু বলবেন?'

'হ্যাঁ স্যার—' রাহেজা মাথা নাড়লেন।

'বলুন।'

'আপনার শরীর ভাল না। এই অবস্থায় অফিসে যাওয়া কি ঠিক হবে? মানে ওয়ার্কাররা ভীষণ এক্সাইটেড হয়ে আছে। ওখানে গেলে—'

অশোক রাহেজাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'আমাকে যেতেই হবে। ডোণ্ট ওরি।'

রাহেজার মুখ দেখে মনে হল, অশোকের কথায় তার আদৌ সায় নেই। তবে কিছু বললেন না।

অশোক বলল, 'আর একটা কাজ করবেন মিস্টার রাহেজা। আমাদের হাউসের ডাইরেক্টরদের মধ্যে ইনার সার্কেল বলে একটা ব্যাপার আছে জানেন তো?'

রাহেজা বললেন 'জানি।'

'ইনার সার্কেলের মেম্বার কারা—জানেন?'

'জানি স্যার।'

'নীচে গিয়ে তাঁদের সবাইকে ফোন করে জানাবেন, আমি একটায় অফিসে আসছি। অনুগ্রহ করে ওঁরা যেন সেই সময় অফিসে থাকেন। খুব জরুরী প্রয়োজন।'

রাহেজা মাথা হেলিয়ে চলে গেলেন।

কাঁটায় কাঁটায় একটায় রাহেজার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল অশোক। হেড অফিসের কাছাকাছি আসতেই লাউডস্পীকারে বহু মানুষের চিৎকার ভেসে এলো।

'লড়াই লড়াই লড়াই চাই—'

'লড়াই করে বাঁচতে চাই।'

'অটোমেসন বাতিল কর—'

'বাতিল কর, বাতিল কর।'

ছাঁটাই করা চলবে না—'

'চলবে না, চলবে না।'

'শ্রমিক ঐক্য—'

'জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ।'

অশোকের লিমুজিন হেড অফিসের ভেতর ঢুকতেই দেখা গেল, হাজার হাজার মানুষ সামনের সুবিশাল কম্পাউণ্ড দখল করে আছে আর আকাশের দিকে হাত ছুঁড়ে ছুঁড়ে স্লোগান দিয়ে যাচ্ছে।

চারদিকে অগুনতি পোস্টার আর ফেস্টুন। সেগুলোর কোনটাতে লেখা—'স্টপ অটোমেসন' বা 'স্টপ রিট্রেঞ্চমেণ্ট' বা 'শ্রমিক মারা নীতি চলবে না', ইত্যাদি ইত্যাদি।

অশোক জানে, হেড অফিসের কর্মী এবং নানা মিল এবং ফ্যাক্টরির শ্রমিক মিলিয়ে তাদের এমপ্লয়ীর মোট সংখ্যা ছাব্বিশ হাজার একশো। মনে হল, একজন ওয়ার্কারও বাদ নেই, সবাই হেড অফিসে এসে জমা

হয়েছে।

কম্পাউণ্ডে ঢোকার পরও ভিড়ের চাপে অশোকের লিমুজিন এগুতে পারছিল না।

এদিকে রাহেজা গাড়ি থেকে নেমে পড়েছেন। স্লোগানের তোড় একটু কমে এলে তিনি চীৎকার করে বলতে লাগলেন, 'শুনুন, আপনারা শুনুন। চেয়ারম্যান এসেছেন, আপনারা দয়া করে একটু জায়গা করে দিন।'

ছাব্বিশ হাজার একশো জোড়া চোখ এদিকে এসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে গলার স্বর দশ গুণ চড়িয়ে শ্রমিক-কর্মচারীরা চেঁচিয়ে উঠল।

'অটোমেশন—'

'বন্ধ কর, বন্ধ কর।'

'কম্পিউটার বসানো—'

'চলবে না, চলবে না।'

'শ্রমিকমারা নীতি—'

'বন্ধ কর, বন্ধ কর।'

অশোককে দেখে চারদিকে গনগনে আগুনের মতো উত্তেজনা ছড়িয়ে যেতে লাগল। রাহেজার মতো স্মার্ট অভিজ্ঞ প্রফেসনাল সেক্রেটারিও অত্যন্ত বিপন্ন আর নার্ভাস বোধ করলেন। এই মুহূর্তে কী করা উচিত বুঝতে না পেরে অশোকের কাছে দৌড়ে এলেন। বললেন, 'স্যার, ওয়ার্কাররা যে রকম এক্সাইটেড হয়ে আছে তাতে মারাত্মক কিছু ঘটে যেতে পারে। আমার মনে হয়, আপাতত বাড়ি ফিরে গেলে ভাল হয়। পরে আবহাওয়াটা একটু শান্ত হলে একটা কিছু করা যাবে।

অশোক বলল, 'ফেস দেম বোল্ডলি। এসেই যখন পড়েছি তখন ফেরার কোন প্রশ্নই ওঠে না। ওদের বলুন, কম্পিউটারের ব্যাপারে ওদের রিপ্রেজেন্টেটিভদের সঙ্গে আমি আজই কথা বলব। আমি অসুস্থ, ওরা যেন দয়া করে আমাকে একটু ভেতরে যাবার রাস্তা করে দেয়।'

চন্দ্রকান্ত রাহেজা শ্রমিক কর্মচারীদের ভেতরে গিয়ে চিৎকার করে অশোকের কথাগুলো জানিয়ে দিলেন। তাতে কাজ হল।

এই হাউসে গোটা পাঁচেক শ্রমিক ইউনিয়ন আছে। তাদের মধ্যে একটাই প্রধান। বাকীগুলো খুবই নগণ্য।

বড় ইউনিয়নটার প্রেসিডেণ্ট ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী, ভাইস প্রেসিডেণ্ট আব্দুল তালেব, সেক্রেটারি রণজিৎ সমাদ্দার, জয়েণ্ট সেক্রেটারি হরনাথ, ট্রেজারার রামরতন দুবে এই অবস্থান ধর্মঘটে শ্রমিকদের মধ্যেই ছিলেন। তাঁরা ভিড় সরিয়ে অশোকের লিমুজিনটাকে পার্কিং লটে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে দিলেন। অশোক গাড়ি থেকে নামতেই তাঁরা আন্তরিক ভাবেই জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি ইনজিওরড হয়েছেন শুনেছিলাম, নার্সিং হোমে যেতে হয়েছিল। এখন কেমন আছেন?'

'ভালই আছি। ধন্যবাদ।' অশোক খুব সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে ভিড়ের ভেতর দিয়ে হেড অফিস বিল্ডিংয়ের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। ইউনিয়ন নেতারা এবং চন্দ্রকান্ত রাহেজা তার পাশে পাশে হাঁটতে লাগলেন।

হরনাথ অশোকের ডান ধারে ছিল। খুব আস্তে করে নীচু গলায় বলল, 'এই অবস্থায় না এলেই ভাল হত। পরশু শরীর থেকে এতটা রক্ত বেরিয়ে গেল!'

অশোক বলল, 'ব্যক্তিগত কথাবার্তা থাক। ছাব্বিশ হাজার একশো ওয়ার্কারের জন্যে আমাকে এখানে দৌড়ে আসতে হয়েছে। আমার শরীর থেকে রক্ত বেরুনোর চাইতেও ওটা অনেক বেশী জরুরী।'

হরনাথের ভেতর থেকে এক মুহূর্তের জন্য সেই স্নেহশীল মানুষটি বেরিয়ে এসেছিল—অপার মমতায় ছোটবেলা থেকে অশোককে যে বড় করে তুলেছে। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে গুটিয়ে নিল হরনাথ। আর কিছু বলল না।

লিফ্‌ট পর্যন্ত ইউনিয়ন লীডাররা সঙ্গে সঙ্গে এলেন। যেতে যেতে অশোকের চোখে পড়ছিল, দেওয়ালের কোথাও এক সেন্টিমিটার ফাঁকা নেই। সব জায়গায় গাদা গাদা পোস্টার সাঁটা রয়েছে।

রাহেজা লিফ্‌টের দরজা খুলে দিলেন। অশোক ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে শ্রমিক নেতাদের বলল, 'আপনারা দয়া করে চলে যাবেন না।'

ইউনিয়নের প্রতিনিধি হিসেবে ইন্দ্রজিৎ বললেন, 'যাওয়ার কোন প্রশ্নই নেই। কম্পিউটারের ব্যাপারে যতক্ষণ না কোন ডিসিসান হচ্ছে, আমরা এখান থেকে কোথাও যাচ্ছি না।'

'গুড। আমি সাড়ে তিনটের সময় আপনাদের সঙ্গে বসব।'

'ধন্যবাদ স্যার।'

রাহেজা বোতাম টিপে দিলেন। ঝিঁঝির ডাকের মতো একটানা আওয়াজ করে লিফ্‌টটা কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ফোরটিনথ্‌ ফ্লোরে উঠে এলো।

বার

ওয়ার্কাররা সবাই সিট-ইন স্ট্রাইক করলেও ম্যানেজারিয়াল স্টাফ আর একজিকিউটিভরা এর মধ্যে নেই। শতকরা আটানব্বই জন এমপ্লয়ী যদি কাজ না করে, মাত্র টু পারসেণ্ট অফিসার দিয়ে অফিস চালু রাখা সম্ভব না। গোটা হাউস অচল হয়েই আছে।

শ্রমিক-কর্মচারীরা হেড-অফিসের গোটা কম্পাউণ্ড আর মেইন গেট জুড়ে বসে থাকলেও অফিসারদের আটকায় নি। অফিসাররা এই স্ট্রাইকের মধ্যে নিয়মিত অফিসে এসেছেন এবং অলস সময় কাটিয়ে ফিরে গেছেন। আজও তাঁরা নিজের নিজের ঘরেই রয়েছেন। এদের কোন ইউনিয়ন নেই।

যাই হোক, অশোক তার চেম্বারে ঢুকতেই পার্ল সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল। অফিস সংক্রান্ত কাজের ব্যাপারে এই পার্শী তরুণীটি তার পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যাণ্ট।

পার্ল বলল, 'গুড মর্ণিং স্যার—'

'গুড মর্ণিং।' অশোক বিশাল সেমি সার্কুলার টেবলের ওধারে

গিয়ে তার চেয়ারে বসতে বসতে বলল।

এরপর অশোকের মাথার এবং শরীরের অন্যান্য জায়গার আঘাত সম্পর্কে খোঁজ নিল পার্ল।

সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে অশোক বলল, 'অপারেটররাও কি স্ট্রাইক করেছে?'

পার্ল বলল, 'হ্যাঁ স্যার।'

'তাহলে ডাইরেক্ট লাইনে দেখুন মিস্টার বিলিমোরিয়া, মিস্টার আগরওয়ালা, মিস্টার সান্ধু, মিস্টার ভট্টাচারিয়া আর মিস্টার গোমেজ এসেছেন কিনা?'

'এসেছেন স্যার। সেই একটা থেকে সিক্সটিন্‌থ্ ফ্লোরের কনফারেন্স রুমে অপেক্ষা করছেন।'

অশোক বলল, 'ওঁদের জানিয়ে দিন, দয়া করে যেন আমার চেম্বারে চলে আসেন। আমার শরীরটা উইক। বাড়ি থেকে অফিস পর্যন্ত আসতেই বেশ কষ্ট হচ্ছে। এক্ষুনি আমায় কনফারেন্স রুমে যেতে হলে স্ট্রেন হবে।'

পার্ল ফোন করে বিলিমোরিয়াদের অশোকের কথা জানিয়ে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যে হাই-পাওয়ার কমিটির মেম্বাররা অশোকের চেম্বারে চলে এলেন এবং তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে উদ্বিগ্নভাবে খোঁজ খবর নিয়ে মুখোমুখি বসলেন।

চন্দ্রকান্ত রাহেজা এক কোণে অ্যাটেনসানের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি জানেন ইনার কমিটির মিটিংয়ের সময় অন্য কারও থাকতে নেই। পার্লেরও এ ব্যাপারটা অজানা নয়। ওরা দুজনেই চেম্বার থেকে বেরিয়ে যায়।

অশোক একটা সেকেণ্ডও নষ্ট না করে বলতে থাকে, 'খুব জরুরী একটা দরকারে আপনাদের এখানে ডাকিয়ে আনলাম। নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হল।'

হাই-পাওয়ার কমিটির সদস্যরা সমস্বরে বলে উঠলেন, 'না না, ইট্‌স প্লেজার।'

'আমার শরীরের অবস্থার কথা ভেবে আমাকে ক্ষমা করবেন।' অশোক বলল।

বিলিমোরিয়া বললেন, 'এ কী বলছেন স্যার! আমাদের খুব অস্বস্তি হচ্ছে।'

এ কথার উত্তর না দিয়ে অশোক বলল, 'নাউ অন টু বিজনেস। কাজের কথায় আসা যাক—'

সবাই টেবলের ওধারে মেরুদণ্ড টান টান করে বসলেন।

অশোক কিছুটা রুক্ষ গলায় বলতে শুরু করল, 'আমাদের এখানে কম্পিউটার বসাবার ব্যবস্থা হয়ে গেছে. অথচ হাউসের টপমোস্ট পার্সন হয়েও আমি কিছুই জানি না। আমাকে বাদ দিয়ে এত বড় একটা ব্যাপারে ডিসিসান নেওয়া হল, ইট্স রীয়েলি স্ট্রেঞ্জ।'

বিলিমোরিয়া নড়েচড়ে বসলেন। তাঁদের মুখপাত্র হিসেবে ভট্টাচারিয়া বলে উঠলেন, 'স্যার, বিষয়টা আপনাকে জানানোর মতো ইম্পর্ট্যান্ট বলে মনে হয় নি। ভেবেছিলাম, সামান্য ব্যাপার—'

'সামান্য না অসামান্য, ছাব্বিশ হাজার ওয়ার্কারের সিট-ইন স্ট্রাইক দেখে আপনাদের কী মনে হচ্ছে?'

ভট্টাচারিয়া চিন্তাগ্রস্তের মতো বললেন, 'ব্যাপারটা যে এভাবে টার্ণ নেবে, ঠিক বুঝতে পারিনি।'

হঠাৎ কী মনে পড়তে বিলিমোরিয়া বললেন, 'এক্সকিউজ মী স্যার, একটু ইন্টারাপ্ট করছি। মিস্টার ভট্টাচারিয়া একটা ব্যাপার জানেন না। লাস্ট উইকে দিল্লী ছিলেন। কালই ফিরেছেন মাত্র—'

অশোক বলল, 'ঠিক আছে, বলুন—'

বিলিমোরিয়া বললেন, 'আপনার হয়তো মনে নেই, লাস্ট হাই-পাওয়ার মীটিংয়ে আপনাকে কম্পিউটারের কথা জানানো হয়েছিল।'

'আমার মেমোরি খুব খারাপ না মিস্টার বিলিমোরিয়া। আপনারা জানিয়েছিলেন, জাপান আর আমেরিকায় কোথায় যেন, আমি এই হাউসে আসার আগেই কটা কম্পিউটারের অর্ডার দেওয়া হয়েছে।'

'হ্যাঁ স্যার।'

'কিন্তু সেগুলো রবিবার, যখন কেউ অফিসে থাকবে না, অফিসে এনে বসাবার কথাটা এমপ্লয়ীদের তো নয়ই, আমাকেও জানানো হয় নি।'

'হঠাৎ কনসাইনমেন্টটা এসে গেল কিনা। তবু আপনাকে ফোনে ধরার চেষ্টা করেছিলাম। আপনি বাড়ি ছিলেন না। মেসেজও রেখে দিয়েছিলাম।'

অশোকের মনে পড়ল, রবিবার সকালে পারমিতার সঙ্গে বেলে-ঘাটার বস্তিতে তাঁর 'নব জীবন প্রকল্পের' কাজ দেখতে গিয়েছিল সে। সেখান থেকে হর্টিকালচার গার্ডেনে ফ্লাওয়ার-শো ওপেন করতে গিয়েছিল, তারপর টালিগঞ্জের ব্যারাক-বাড়িতে। টালিগঞ্জ থেকে ইঁটের ঘায়ে বেহুঁশ হয়ে নার্সিং হোমে। এর মধ্যে মেসেজ পাওয়ার উপায় ছিল না।

অশোক একটু ভেবে বলল, 'আমি রবিবার সারাদিনই বাড়ি ছিলাম না। তাই মেসেজ পাই নি। কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না—'

'কী?'

'কম্পিউটারগুলো কিসে এসেছে—প্লেনে না জাহাজে?'

'জাহাজে।'

'জাহাজে এলে শিপিং কোম্পানি নিশ্চয়ই কনসাইনমেন্টের খবর আগেই জানিয়ে দেয় যাতে ক্লায়েন্ট সঙ্গে সঙ্গে মাল ছাড়িয়ে নিতে পারে।'

বিলিমোরিয়া অস্বস্তি বোধ করলেন। বললেন, 'তা জানায়।'

'আমাদের কম্পিউটার নিয়ে জাহাজ কবে ক্যালকাটা পোর্টে এসেছে?'

বিরুদ্ধ পক্ষের ঝুঁদে ব্যারিস্টারের মতো উল্টোপাল্টা জেরা করে করে অশোক ব্যানার্জি নামে এই পেডিগ্রি-হীন স্লাম ডোয়েলার ছোকরাটি যে তাঁকে কোণঠাসা করে ফেলবে, এতটা বিলিমোরিয়ারা ভাবতে পারেন নি। ভাসা ভাসা ভাবে তিনি বললেন, 'লাস্ট উইকে

এসেছে।'

'শিপিং কোম্পানি কবে কনসাইনমেণ্ট ছাড়িয়ে নেবার জন্য খবর পাঠিয়েছিল?'

এয়ার কণ্ডিশানড চেম্বারে বসেও বিলিমোরিয়া প্রায় ঘেমে উঠলেন, এই তো তিন-চার দিন আগে। মানে—'

অশোক বলল, 'শিপিং কোম্পানিতে খোঁজ নিয়ে কবে জাহাজ এসেছে, কবে ওরা মাল ছাড়াতে বলেছে, এ সব জানতে চেয়ে আপনাদের বিব্রত করতে চাই না। তবে একটা কথা আপনাদের পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছি—'

সবাই উদগ্রীব তাকিয়ে থাকেন।

অশোক বলতে লাগল, 'আমাকে না জানিয়ে এই হাউসের কোন ব্যাপারে কোন ডিসিসান নেওয়া চলবে না।'

সবাই একসঙ্গে বলে উঠলেন, 'নিশ্চয়ই স্যার, ভবিষ্যতে এ রকম আর হবে না।'

একটু চুপচাপ। তারপর অশোক বলল, 'এমপ্লয়ীরা যে সিট-ইন স্ট্রাইক করে বসে আছে, এ নিয়ে আপনারা কিছু ভেবেছেন?'

সান্ধু সাহেব বললেন, 'ভাবাভাবির কিছু নেই স্যার। আপনি আসার অনেক আগে থেকেই ডিসিসান নেওয়া ছিল, কম্পিউটার বসবে। শুধু তা-ই না, ফেজড্ প্রোগ্রাম নিয়ে ফ্যাক্টরিগুলোও মডার্ণাইজ করা হবে। আপনার আগে সোমদেব চ্যাটার্জি যখন ছিলেন, তাঁর চেয়ারম্যানশিপেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।'

অশোক বলল, 'এই ইনফরমেসনটা আমার কাছে অজানা নয়। এর আগে যখন হাই-পাওয়ার কমিটির মিটিং বসেছিল তখনই আপনারা আমাকে এ ব্যাপারে জানিয়ে ছিলেন। কিন্তু আমাদের মতো হিউজ ম্যানপাওয়ার যে দেশে, যে দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ বেকার সেখানে মডার্ণাইজেসন বা অটোমেসনের নামে নতুন বেকার তৈরী হতে দেওয়া যায় না।'

'কিন্তু স্যার—' আগরওয়ালা বলে উঠলেন, 'যদি পারমিসান দেন

তো একটা কথা পেশ করি।'

'অবশ্যই—' অশোক ডান দিকে টেবলের কোণাকুণি বিপুল চেহারার ইণ্ডাস্ট্রিয়াল টাইকুন ব্রিজলাল আগরওয়ালার দিকে তাকাল।

আগরওয়ালা বলতে লাগলেন, 'স্যার আপনি অনেক জ্ঞেয়ানী মানুষ আছেন। লর্ণেড ভি। আপনি জরুর জানেন ফরেনে, মতলব মিডল-ইস্টের কুয়েত, ইরাক, ইজিপ্ট, আরব এমেরিটাস, আফ্রিকার তিন চারটে কান্ট্রি আর ফার-ইস্টের দশ বারোটা স্টেটে আমাদের এক্সপোর্ট মার্কেট আছে। ইওরোপ, আফ্রিকা আর এশিয়ার নানা জায়গায় আমরা নয়া নয়া মার্কেট ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছি।'

'জানি।'

'আপনি জানেন, আমাদের টার্ণ-ওভারের থার্টি পারসেন্ট হয় ফরেন এক্সপোর্ট থেকে।'

'আই নো ইট।'

'তা তো জানবেনই, তা তো জানবেনই। স্যার না জানেন কী, না বোঝেন কী।'

লোকটা বেশি কথা বলে। অশোক ভেতরে ভেতরে খুবই বিরক্ত হচ্ছিল কিন্তু বাইরে তা ফুটে উঠতে দিল না। হাই-পাওয়ার কমিটির মাননীয় সদস্যদের কাছে বিরক্তি প্রকাশ করা সম্ভব না। সে বলল, 'আমার কথা থাক। আসল ব্যাপারটা কী?'

আগরওয়ালা বললেন, 'আসল বেপারের দিকেই তো কদম কদম এগিয়ে যাচ্ছি। আগে থোড়াসে ইনট্রোডাকসান তো করে নিতে হবে।'

অশোক উত্তর দিল না।

আগরওয়ালা ফের বললেন, 'আপনি জানেন, আমরা যেসব জায়গায় এক্সপোর্ট করি, জাপান ইউ-কে, কানাডা আর ওয়েস্ট জার্মানিও সেখানে ঘুষবার কোসিস করছে।'

'জানি।' অশোক বুঝতে পারল, কিছুতেই তাড়াতাড়ি কাজের কথায় আসবেন না আগরওয়ালা। যতক্ষণ না আসল জায়গায় তিনি

পৌঁছুচ্ছেন, অশোককে অনবরত 'জানি জানি' করে যেতে হবে।

আগরওয়ালা বলতে লাগলেন, 'আপনি জানেন ঐ কান্ট্রিগুলো টেকনোলজির দিক থেকে কত অ্যাডভান্সড্। প্রযুক্তিবিদ্যাকা হাইয়েস্ট পীকে ওরা পৌঁছে গেছে।'

'জানি।'

'ভবিষ্যতে ওদের সঙ্গে আমাদের কমপিটিসন করতে হবে।'

'জানি।'

'পুরানো মান্ধাতা আমলের মিশিনে যে প্রোডাক্ট বেরুবে তা দিয়ে ইউ-কে, জাপানের সঙ্গে কমপিটিসনে আমরা পারব না।'

'জানি। এ নিয়ে আগেও আমাদের মধ্যে কিছু ডিসকাসান হয়েছে।'

আগরওয়ালা বলে যেতে লাগলেন, 'তার রেজাল্ট কী হবে জানেন, ঐ সব মার্কেট থেকে আমরা বিলকুল হটে যাব।'

অশোক উত্তর দিল না।

আগরওয়ালা ফের বললেন, 'তা হলে এক্সপোর্ট মার্কেটের জন্যে আমরা যে প্রোডাক্ট বানাই তা বন্ধ করে দিতে হবে। শুধু তাই না, এক্সপোর্টের জন্যে আমরা একটা বিরাট ইউনিটও খুলেছি। সেখানেও তালা ঝুলিয়ে দিতে হবে। তার রেজাল্ট হবে কমসে কম হাজার ওয়ার্কার বেকার।'

অশোক বলল, 'যদি দরকার হয়, ডোমেস্টিক মার্কেটে ঐ প্রোডাক্ট চালাব।'

'ইম্পসিব্‌ল—' বিলিমোরিয়া হঠাৎ বলে উঠলেন, 'গভর্ণমেণ্ট হানড্রেড পারসেন্ট এক্সপোর্টের জন্যেই ওই ইউনিটটা খুলতে দিয়েছিল। ডোমেস্টিক মার্কেটে ওখানকার প্রোডাক্ট চালানো যাবে না।'

অশোক খানিকক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর বলল, 'ফরেন মার্কেটে এখনও তো আমাদের মাল চলেছে। ও ব্যাপারে পরে ভাবা যাবে। যে প্রবলেমটা সম্বন্ধে এই মুহূর্তে আমাদের ডিসিসান নিতে হবে সেটা নিয়ে কথা বলা যাক।'

বিলিমোরিয়ারা একসঙ্গে বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

অশোক বলল, 'আপনারা সবাই দেখছেন, কমপিউটার বসাতে গেলে তার ফল কী দাঁড়ায়। আমাদের সমস্ত ইউনিট বন্ধ হয়ে গেছে। ছাব্বিশ হাজার ওয়ার্কার কন্টিনিউয়াস সিট-ইন স্ট্রাইক শুরু করে দিয়েছে। এভরিথিং ইন আওয়ার হাউস ইজ টোটালি প্যারালাইজড্।'

সান্ধু বললেন, 'স্যার, নতুন কিছু ইনট্রোডিউস করতে গেলে বাধা তো আসবেই। নানা অপজিসনের মধ্যেও বম্বে ব্যাঙ্গালোর ফরিদাবাদে মডার্ণাইজেসনের কাজ চলছে। এখন কোন রকমে চলে যাচ্ছে, কিন্তু ইণ্ডাস্ট্রি চালাতে গেলে দশ বছর পরের কথা ভেবে তো প্ল্যান করতে হবে।'

অশোক বলল, 'আমাদের মত গরীব দেশে যেখানে কোটি কোটি মানুষ বেকার, কোটি কোটি মানুষ পভার্টি লাইনের নীচে, সেখানে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেভলাপমেণ্ট কীভাবে করতে হবে সে সম্বন্ধে একটা ন্যাশনাল পলিসি তৈরি করা দরকার। মনে রাখতে হবে ইণ্ডাস্ট্রি বা এগ্রিকালচার—এই দুটো ভাইটাল জায়গায় আমাদের এমন নীতি নিতে হবে যাতে পীপল উপকৃত হয়। দেশের সব কিছুই পীপলের জন্যে। কিন্তু সে ব্যাপারে এই মুহূর্তে না ভাবলেও চলবে। এখন যেটা সব চাইতে বেশি দরকার তা হল কম্পিউটার বসানো সম্পর্কে ডিসিসান নেওয়া।'

বিলিমোরিয়া বললেন, 'বেশ তো, এ সম্বন্ধে আপনার মত কী?'

'আমার মত হল, আপাতত এই হাউসে কম্পিউটার বসবে না। এমনিতেই লোক চাকরি পাচ্ছে না। কম্পিউটার বসিয়ে ছাঁটাইয়ের ব্যবস্থা আমি কিছুতেই হতে দেব না।'

কেউ কোন মন্তব্য না করে একদৃষ্টে অশোকের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

একটানা কথা বলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল অশোক। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলল, 'সোসাল প্যাটার্ণ চেঞ্জ করার জন্যেই আমি আপনাদের হাউসে এসেছিলাম। আর আমি এখানে থাকতে থাকতেই

আপনারা নতুন স্পীসিসের বেকার তৈরী করতে চান।'

বিলিমোরিয়া বললেন, 'যারা এখানে কাজ করছে তাদের একজনকেও আমরা ছাঁটাই করব না স্যার। আমাদের হাউসের হিস্ট্রিতে রিট্রেঞ্চমেণ্টের কোন নজীর নেই। আমরা পঁচাত্তর বছর ধরে পীপল এবং কান্ট্রিকে সারভিস দিয়ে আসছি।'

অশোকের মুখে একটা খিস্তি এসে গিয়েছিল। কিন্তু দেশের বিশাল এক ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এম্পায়ারের, টপমোস্ট ব্যক্তির মুখে বস্তির চাঁছাছোলা খিস্তি মানায় না। অশোক নিজের জিভকে প্রাণপণে সামাল দিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, 'ছাঁটাই হয়তো করবেন না কিন্তু নতুন লোক রিক্রুটমেণ্টের কী হবে?'

কেউ উত্তর দিলেন না।

অশোক আবার বলল, 'অ্যাপয়েণ্টমেণ্টের রাস্তা যদি বন্ধ হয়ে যায়, প্রত্যেক বছর কলেজ ইউনিভারসিটি, টেকনিক্যাল স্কুল, ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট—এ সব জায়গা থেকে যে লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে বেরিয়ে আসছে তাদের কী হবে?'

এবারও সবাই চুপচাপ রইলেন।

অশোক এবার বলল, 'আমি খুবই অসুস্থ। এয়ার-কণ্ডিশানড চেম্বারে দু'ফুট গদিতে বসেও কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে! একটু পরেই আমি বাড়ি ফিরে যাব। তার আগে আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি, কম্পিউটার বসবে না, বসবে না, বসবে না। তবু কেউ যদি জোর করে বসাতে চান, আমি যে ভাবেই হোক আটকাব।'

বিলিমোরিয়ারা নিজেদের মধ্যে নীচু গলায় গুজ গুজ করে কিছু পরামর্শ করে নিলেন। তারপর বললেন, 'ঠিক আছে স্যার, আপনার যখন ইচ্ছা নয় তখন কম্পিউটার বসবে না। আপনার সম্মানের চাইতে সেটা কখনই বড় নয়।'

এটাও এই ইণ্ডাস্ট্রিয়াল টাইকুনদের কোন চাল কিনা কে জানে। অশোক ভাবল এদের সম্বন্ধে ভবিষ্যতে যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হবে। মুখে সামান্য হাসি ফুটিয়ে অশোক বলল, 'ধন্যবাদ। তা হলে

ইউনিয়নকে ডাকা যাক।'

'কেন স্যার ?'

'ওদের জানিয়ে দিতে হবে কম্পিটিউটারের ব্যাপারে আমরা ডিসিসান চেঞ্জ করেছি। না হলে লাগাতার ধর্মঘট চলতেই থাকবে।'

গম্ভীর মুখে বিলিমোরিয়া বললেন, 'নিশ্চয়ই স্যার, ইউনিয়নকে ডাকতেই হবে। তবে আমার একটা কথা ছিল—'

'কী ?'

'এত তাড়াতাড়ি ওদের না-ই বা ডাকলাম।'

'মানে ?' অশোকের চোখ কুঁচকে গেল।

বিলিমোরিয়া বললেন, 'আজই যদি ডাকা হয়, ওরা ভাববে আমরা ভয়ে সারেণ্ডার করছি। তা হলে স্যার, ভবিষ্যতে ওদের ট্যাক্‌ল্‌ করা মুশকিল হয়ে উঠবে। ইউনিয়নকে কোন ভাবেই ম্যানেজমেণ্টের মাথায় চড়তে দিতে নেই।'

'আপনারাই তো বললেন, আমার সম্মান রাখার জন্যে কম্পিউটার বসবে না।'

'তা তো বলেছিই।'

'তা হলে সেটা আজই জানিয়ে দিতে অসুবিধা কোথায় ?'

বিলিমোরিয়ারা উত্তর দিলেন না।

অশোক একটু ভেবে বলল, 'যত দেরী করবেন ততই ম্যান-ডেজ নষ্ট হবে, প্রোডাকসান কমবে, এক্সাইটমেণ্ট বাড়বে। শেয়ারহোল্ডাররা কম ডিভিডেণ্ড পাবেন, গভর্ণমেণ্টের ভাগের ট্যাক্স কমে যাবে।'

ভট্টাচারিয়া বললেন, 'সবই ঠিক স্যার। তবু একটু দেরি করে ইউনিয়নকে জানালে আমার মতে ভাল হবে।'

অশোক বিরক্ত হল। রুক্ষ গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কী রকম ?'

'এখন মাসের ফোর্থ উইক চলছে। আর কয়েক দিন পরেই নতুন মাস পড়ছে। পয়লা তারিখে মাইনে হাতে না পেলে ওয়ার্কারদের মধ্যেই দেখবেন ডিভিসন হয়ে যাবে। আফটার অল যারা চাকরি-বাকরি করে সংসার চালায় তাদের ঘরে ক'টা পয়সা জমা থাকে বলুন। তখন—'

ভট্টাচারিয়া তাঁর কথা শেষ করতে পারলেন না। তার আগেই অশোক বলে উঠল, 'তার মানে গরীব ওয়ার্কারদের জমানো পয়সা নেই। ফলে তারা বেশিদিন স্ট্রাগ্‌ল্‌ করতে পারবে না। আপনারা এই সুযোগটা কাজে লাগাতে চান, এই তো?'

ভট্টাচারিয়া থেকে শুরু করে সান্ধু পর্যন্ত সবাই সমস্বরে বললেন, 'শুধু আমরা কেন, অন্য সব হাউসের ম্যানেজমেন্টও এই ভাবেই সুযোগ নিয়ে থাকে স্যার।'

'স্যরি, ওয়ার্কারদের সম্বন্ধে আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা এখন থেকে পাল্টাতে হবে।' অশোক বলল।

একটু চুপ।

তারপর অশোকই আবার শুরু করল, 'আপনাদের কি ধারণা, ঠিক সময়ে মাইনে না পেলে, মানে পেটে হাত পড়লে ওয়ার্কাররা সারেণ্ডার করবে? কম্পিউটার বসাতে দেবে? আমি তো জানি বছর তিনেক আগে এই হাউসে কন্টিনিউয়াস তিন মাস স্ট্রাইক হয়েছিল। ওয়ার্কাররা তখন সারেণ্ডার করে নি।'

সান্ধু বললেন, 'সহজে ওরা সারেণ্ডার করবে বলে মনে হয় না। এখানকার ইউনিয়ন খুবই স্ট্রং। তবে স্যার খিদে ব্যাপারটা মারাত্মক। পেটে হাত পড়লে ওয়ার্কাররা নিশ্চয়ই ইউনিয়ন লীডারদের ওপর প্রেসার দেবে। লীডারদের অ্যাটিচুড তখন অনমনীয় থাকবে না। তাঁরা আমাদের টেবলের উল্টো দিকে বসতে বাধ্য হবেন।'

'আপনারা তখন রীতিমত উদারতা দেখিয়ে বলবেন, ঠিক আছে, ওয়ার্কারদের কথা বিবেচনা করে আমরা কম্পিউটার বসাচ্ছি না— এই তো?'

'অনেকটা তাই।'

অশোক সামনের দিকে অনেকখানি ঝুঁকে আচমকা জিজ্ঞেস করল, 'ইণ্ডিয়া এখন স্বাধীন দেশ, তাই না?'

সে কী বলতে চায়, বুঝতে না পেরে বিলিমোরিয়া চুপ করে রইলেন।

অশোক বলতে লাগল, 'ওয়ার্ল্ডের কোন স্বাধীন রাষ্ট্রেই ওয়ার্কারদের সঙ্গে ম্যানেজমেন্টের সম্পর্কটা প্রভু-ভৃত্যের মতো হওয়া উচিত না। আসলে ইণ্ডিপেনডেন্সের তেত্রিশ বছর বাদেও আমাদের ঘাড়ে কলোনিয়াল মাস্টারদের স্পিরিট এখনও ভর করে আছে।' একটু থেমে বলল, 'আমাদের টোটাল আউটলুকটা বদলে ফেলতে হবে। ওয়ার্কার আর ম্যানেজমেন্ট—এই দুটোকে আলাদাভাবে দেখলে চলবে না। দুটো মিলিয়ে কমপ্লীট ইউনিট। একে অন্যের কমপ্লিমেন্টারি।'

বিলিমোরিয়া বললেন, 'অবশ্যই। তবে স্যার, ওয়ার্কারদের সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি বদলেও একটা কথা মনে রাখতে হবে।'

'কী সেটা ?'

'অ্যাডমিনিস্ট্রেসন।'

'একটু বুঝিয়ে বলুন।'

বিলিমোরিয়া এবার যা বললেন তা এই রকম। স্বাধীন রাষ্ট্রে শ্রমিক কর্মচারীদের সম্পর্কে যে নীতিই নেওয়া হোক না তা হওয়া উচিত উদার এবং মানবিক। তাদের সঙ্গে আন্তরিক এবং হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহারও করতে হবে। তবু ডিসিপ্লিন বলে একটা কথা আছে। ইণ্ডাস্ট্রিতে সেটা বজায় রাখতেই হবে। আর সেটা রাখতে হলে ম্যানেজমেন্ট এবং ওয়ার্কারদের মধ্যে কিছুটা দূরত্ব থাকা দরকার। খুব বেশি মাখামাখি হলে শ্রদ্ধার ভাবটা কিন্তু থাকে না। তাতে ম্যানেজমেন্টের পক্ষে অনেক সময় কড়া স্টেপ নিতে অসুবিধা হয়। অথচ দরকার মতো স্ট্রিক্ট না হলে শিল্পে শান্তি থাকবে না। ম্যানেজমেন্টের নামে চিরকালই অথরিটেরিয়ানিজমের দুর্নাম আছে। শ্রমিকদের মধ্যেও ইচ্ছামতো চলবার প্রবণতা দেখা দিতে পারে। তার ফলাফল ভাল হবে না। অনবরত অশান্তি এবং উত্তেজনা লেগেই থাকবে।

অশোক বলল, 'এখানে আসার পর একটা ব্যাপার আমি লক্ষ্য করেছি—'

'কী স্যার ?' বিলিমোরিয়া জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন।

'এই হাউসে ছাব্বিশ হাজারের বেশি ওয়ার্কার। অথচ ম্যানেজ-

মেণ্টে তাদের একজন রিপ্রেজেণ্টেটিভও নেই। আমাদের মতো হাই-পাওয়ার কমিটির পাঁচজন মেম্বারই এখানকার সব পলিসি ঠিক করি। এবং সেটা ছাব্বিশ হাজার মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দিই। এ রকম অদ্ভুত সিস্টেম কী ভাবে যে চলছে, সেটা ভাবলে অবাক হতে হয়।'

অশোকের কাছ থেকে এ জাতীয় কথা কেউ প্রত্যাশা করেন নি। হাই-পাওয়ার কমিটির মাননীয় সদস্যরা প্রায় চমকে উঠলেন। চমকটা একটু থিতোলে সান্ধু বললেন, 'অ্যাডমিনিস্ট্রেসন চালাতে হলে যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতার দরকার। একজন সাধারণ ওয়ার্কারের মধ্যে সে সব পাওয়া কি সম্ভব?'

অশোক বলল, 'সাধারণ ওয়ার্কারকেই বা বেছে নেবেন কেন। শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে সবাই ইণ্টেলিজেন্স বা শিক্ষাদীক্ষায় একেবারে লোয়েস্ট লেভেলে পড়ে আছে, এটাই বা ভাবছেন কেন? ছাব্বিশ হাজার লোকের ভেতর একজনও বুদ্ধিমান নেই, এটা ভাবা আমার পক্ষে কষ্টকর। রাইট পার্সনটিকে বেছে নেবার দায়িত্ব আপনাদের।'

কেউ উত্তর দিলেন না।

অশোক থামে নি। সে একটানা বলতে লাগল, 'আর যোগ্যতা, সেটা প্রমাণ হবে কী ভাবে? সে জন্য সুযোগ তো পাওয়া চাই। এক্সপীরিয়েন্স সম্পর্কেও একই কথা। যদি কিছু মনে না করেন, আপনাদের একটা কথা বলতে চাই—'

সবাই কোরাসে গলা মেলালেন, 'কিছু মনে করব না, আপনি বলুন।'

'আপনারা যাঁরা ইণ্ডিয়ার ফোরমোস্ট শিল্পপতি, তাঁরা কিন্তু যোগ্যতা আর অভিজ্ঞতার ঝোলা কাঁধে করে এই পৃথিবীতে আসেন নি। কাজ করতে করতেই এ সব অর্জন করেছেন।'

'রাইট স্যার, রাইট।' আগরওয়ালা বললেন, 'আপনি বোধহয় ওয়ার্কারদের ভেতর থেকে দু-একজনকে ম্যানেজমেণ্টে ঘুষিয়ে দিতে চাইছেন।'

অশোক বলল, 'একজ্যাক্টলি।'

'তার রেজাল্টটা কী দাঁড়াবে, ভাবতে পারেন?'

'কী?'

'বঙ্গালীতে একটা কথা আছে না, শেরের ঘরে ঘোগ। ঘোগ হয়ে ম্যানেজমেণ্ট ঘুষে ডিমাণ্ড করে জান চৌপাট করে দেবে। এমনিতেই ডিম্যাণ্ড করে করে ওরা সত্যনাশ করে ছাড়ছে। স্যার নয়া ঝামেলাকে বরণডালা সাজিয়ে ইনভাইট করে আনবেন না।'

'এ সব নিয়ে পরে আলোচনা হবে। তবে একটা কথা বলে রাখি, ম্যানেজমেণ্টে ওয়ার্কারদের রিপ্রেজেণ্টেটিভ নিলে প্রবলেম অনেক কমে যেত। যাক, ইউনিয়ন লীডারদের ডেকে আমাদের ডিসিসানটা জানিয়ে দেওয়া যাক।'

এত দ্রুত ব্যাপারটা কেউ মিটিয়ে ফেলতে চান নি। এটা তাঁদের কাছে একটা ডিফিট বলেই মনে হয়েছে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিলিমোরিয়া বললেন, 'ঠিক আছে স্যার, আপনি যখন বলছেন তখন ওঁদের জানানো হোক। তবে—'

'তবে কী?'

'ওদের ডাকার আগে দু-একটা ফর্মালিটি আছে।'

'কী রকম?'

'ডেট আর টাইম ঠিক করে ইউনিয়ন অফিসে চিঠি পাঠাতে হবে।'

অশোকের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। সে বুঝতে পারছে, বিলিমোরিয়া এ ভাবে খানিকটা সময় নিতে চাইছেন। কিন্তু কোন ভাবেই দেরি করলে হবে না। অশোক বলল, 'আমার পি-একে ডাকিয়ে এখনই চিঠির ব্যবস্থা করছি। মোট কথা, আজ চারটের মধ্যে কম্পিউটারের ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে চাই।' বলেই বেল বাজিয়ে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে একটা বেয়ারা বাইরে থেকে দৌড়ে এসে অ্যাটেনসনের ভঙ্গিতে দাঁড়াল। অশোক তাকে পার্লকে ডেকে আনতে বলল।

পার্ল এলে অশোক বিলিমোরিয়াকে বলল, 'ফর্মালিটির ব্যাপারটা

আমি ঠিক জানি না। আপনারা পার্লকে নোট দিন। ও এক্ষুনি টাইপ করে দেবে।'

বিলিমোরিয়ার কাছ থেকে নোট নিয়ে পনেরো মিনিটের মধ্যে টাইপ করে ফেলল পার্ল। তারপর কোম্পানি সেক্রেটারি কার্লেকারকে ডাকিয়ে এনে চিঠিতে সই করিয়ে বেয়ারা দিয়ে ইউনিয়ন অফিসে পাঠিয়ে দেওয়া হল। এ জাতীয় চিঠিতে সেক্রেটারিরই সই করা এই হাউসের নিয়ম।

তের

সাড়ে তিনটেয় ইউনিয়ন লীডারদের অশোকের চেম্বারে আসতে বলা হয়েছিল। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে সময় মিলিয়ে তাঁরা চলে এলেন। মোট পাঁচজন—রণজিৎ সমাদ্দার, রামরতন তুবে, হরনাথ, আবতুল তালেব আর ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী।

বিলিমোরিয়ারা এখনও আশোকের চেম্বারে বসে আছেন। তবে বসার অ্যারেঞ্জমেন্টটা একটু অন্য রকম করা হয়েছে। টেবিলের ওধারে অশোককে মাঝখানে রেখে তার তু'পাশে বিলিমোরিয়া, সান্থু ভট্টাচারিয়া এবং আগরওয়ালা বসেছেন। টেবিলের এ ধারে কয়েকটা চেয়ার সাজানো রয়েছে। সেগুলো ইউনিয়ন লীডারদের জন্য। অর্থাৎ ম্যানেজমেন্ট এবং ইউনিয়ন মুখোমুখি বসবে।

ম্যানেজমেন্টের তরফ থেকে অশোক বলল, 'আসুন আসুন,—বসুন।'

ইউনিয়ন নেতারা হাত জোড় করে সৌজন্যমূলক নমস্কার জানাতে জানাতে বসে পড়লেন।

কাজের কথা শুরু হবার আগে হরনাথ নিজের অজান্তেই যেন বলে উঠল, 'কেমন আছিস অশোক? অফিসের গোলমালের জন্যে তোকে নার্সিং হোমে দেখতে যেতে পারি নি।'

অশোক বলল, 'এখানে আমরা কেউ শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করতে আসি নি। পার্সোনাল ব্যাপারটা অফিসের বাইরে হবে।'

কয়েক মাস আগে অশোক যখন এই হাউসে আসে, ইউনিয়ন লীডাররা তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে হরনাথও ছিল। অশোক তার শরীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোঁজ নেওয়ায় হরনাথ জানিয়েছিল অফিসের ভেতর সে পার্সোনাল রিলেসান রাখতে চায় না। আজ যে অশোক এ রকম একটা উত্তর দিল তা সেদিনের কথা মনে রেখে।

হরনাথ মুহূর্তে নিজেকে গুটিয়ে নিল। বলল, 'ও ও, আচ্ছা—'

ইউনিয়ন নেতাদেরও সৌজন্যের খাতিরে অশোকের আঘাত-টাঘাত সম্পর্কে খোঁজখবর নেবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু হরনাথের অবস্থা দেখে তাঁরা আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না।

অশোক এবার বলল, 'নাউ অন টু বিজনেস। দরকারী কথায় আসা যাক।'

শিরদাঁড়া টান টান করে বসলেন শ্রমিক নেতারা।

অশোক বলতে লাগল, 'আমাদের বক্তব্য সামান্যই। কম্পিউটার বসানো সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, সব দিক বিবেচনা করে সেটা উইথড্র করা হল। আমাদের হাউসে আপাতত কম্পিউটার বসছে না। আশা করি আপনারা খুশি হয়েছেন—'

শ্রমিক নেতারা এতটা ভাবতে পারেন নি। অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ে তাঁরা প্রায় চেঁচিয়েই উঠলেন, 'খুব খুশি হয়েছি স্যার। এই উইথড্র-য়ালটা আপনার জন্যেই সম্ভব হল। নইলে আমাদের আরও বড় রকমের স্ট্রাগল করতে হত।'

অশোক তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আমার একার কোন ক্রেডিট নেই।' বিলিমোরিয়াদের দেখিয়ে বলল, 'আমরা সবাই মিলে এই ডিসিসান নিয়েছি।'

'ধন্যবাদ স্যার, অশেষ ধন্যবাদ।'

'এবার তা হলে আপনাদের সিট-ইন স্ট্রাইক উইথড্র করে নিন।'

'নিশ্চয়ই স্যার। আজই ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হবে। তবে একটা অনুরোধ। এখন বিকেল হয়ে গেছে, আজ তো আর কাজ হবে না। আপনার অনুমতি হলে কাল থেকে ওয়ার্কাররা ডিউটি শুরু করবে।'

'ঠিক আছে।'

রণজিৎ সমাদ্দার একটু ভেবে বললেন, 'স্যার, আমাদের একটা কথা আছে।'

অশোক জিজ্ঞেস করল, 'কী?'

'ম্যানেজমেণ্ট যে কম্পিউটারের ব্যাপারটা উইথড্র করলেন, সে সম্বন্ধে একটা চিঠি চাই। মানে একটা ডকুমেণ্ট থাকা দরকার।'

'আমার মনে হয় দরকার নেই। ম্যানেজমেণ্ট লিখিত ভাবে আপনাদের জানিয়ে কম্পিউটার বসাতে যায় নি। কাজেই এ নিয়ে চিঠিই বা দিতে যাবে কেন? যত চিঠি চালাচালি হবে ততই সব কিছু জটিল হয়ে উঠবে।'

রণজিৎ সমাদ্দার উত্তর দিলেন না।

অশোক আবার বলল, 'ম্যানেজমেণ্ট আর ওয়ার্কারদের মধ্যে এমন একটা পরিবেশ তৈরি হওয়া দরকার যাতে একদল আরেক দলকে শত্রুপক্ষ না মনে করে। পারস্পরিক বিশ্বাস, আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং আর নির্ভরতা থাকতেই হবে।'

ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী বললেন, 'ঠিকই বলেছেন। তবে এমপ্লয়ার আর এমপ্লয়ী—এ দুটো সেপারেট ক্লাস। আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত দুই ক্লাসের মাঝখানের গ্যাপটা এত বিরাট যে আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং হওয়া মুশকিল। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল আর বিজনেস ওয়ার্ল্ডের সিস্টেমই এমন যে গ্যাপটা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। অথচ ইণ্ডিয়া এখন আর বৃটিশ কলোনি না। স্বাধীন ভারতবর্ষে শ্রমিক মালিকের রিলেশান অন্য রকম হওয়া উচিত ছিল।'

অশোক বলল, 'রাইট। এ নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আমরা পরে বসব। এখন বলুন, চিঠির ব্যাপারে কী হবে?'

রণজিৎ সমাদ্দার কী ভাবছিলেন, বললেন, 'স্যার, এ নিয়ে আমরা মানে ইউনিয়নের লোকেরা আলোচনা করে নিতে চাই। যদি অনুমতি দেন, একটু বাইরে যাব। পনেরো মিনিটের মধ্যে ফিরে এসে অমাদের ডিসিসান জানিয়ে দেব।'

'ঠিক আছে। আপনারা কথা বলে আসুন।'

ইউনিয়ন লীডাররা বাইরে থেকে দশ বারো মিনিটের মধ্যেই ঘুরে এলেন। এসেই রামরতন দুবে বললেন, 'স্যার, ওয়ার্কারদের সম্বন্ধে আপনি যে সহানুভূতি দেখিয়েছেন সে জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ। মনে হচ্ছে আপনাকে আমরা বিশ্বাস করতে পারি। উইথড্রয়াল লেটার দিতে হবে না।'

অশোক বলল, 'অনেক ধন্যবাদ।'

'তা হলে স্যার, আমরা এখন উঠি। শ্রমিক-কর্মচারী বন্ধুদের ব্যাপারটা জানিয়ে দিতে হবে।'

'আসুন।'

ইউনিয়ন লীডাররা নমস্কার জানিয়ে উঠে পড়েছিলেন। হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যেতে অশোক খুব ব্যস্তভাবে বলল, 'প্লীজ একটু দাঁড়িয়ে যাবেন। আরেকটা কথা ছিল—'

শ্রমিক নেতারা জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন।

অশোক এবার যা বলল, তা এইরকম। 'এইমাত্র যে ব্যাপারটা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ঠিক করলাম সেটা নিয়ে যেন কোন রকম উত্তেজনার ঘটনা না ঘটে। এটা কোন পক্ষেরই ভিক্টরি বা ডিফিট নয়। এই হাউসের এটা একটা পারিবারিক ব্যাপার। মনে রাখতে হবে বিগ ফ্যামিলিতে অনেক সময় অনেক কারণেই সমস্যা দেখা দিতে পারে। উত্তেজিত না হয়ে ঠাণ্ডা মাথায় তার সলিউসান বের করতে হবে। তাতে কেউ হয়তো কিছু পেল, কেউ আবার কিছুই পেল না। লাভ-লোকসানের ফ্ল্যাট হিসেব না করে সবার ওপরে জায়গা দেওয়া উচিত পারস্পরিক বোঝাপড়াকে। কম্পিউটার প্রত্যাহারের ঘটনা নিয়ে শ্রমিকপক্ষ যেন মাতামাতি না বাঁধিয়ে দেয়।

শান্তভাবে খুশি মনে যেন এই সমাধান মেনে নেয়।'

ইন্দ্রজিৎ বললেন, 'আপনার এই সাজেসানের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। আমরা কথা দিচ্ছি, কোন রকম অশোভন মাতামাতি হবে না।'

শ্রমিক নেতারা চলে যাবার পর অশোক আর বসল না। বিলিমোরিয়াদের কাছে বিদায় নিয়ে ওল্ড বালিগঞ্জে ফিরেই শুয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ক্লান্তি, দুর্বলতা এবং একটানা কয়েক ঘণ্টা কনফারেন্সের ধকলে দু'চোখ জুড়ে এলো।

সন্ধ্যের পর ঘুম ভাঙতে খানিকটা ফ্রেশ লাগল অশোকের। সঙ্গে সঙ্গে কোত্থেকে একটা নার্স চকোলেট মেশানো গরম দুধ নিয়ে বিছানার সামনে এসে দাঁড়াল। নার্সটা যেন তার ঘুম ভাঙার জন্যই এতক্ষণ শিরদাঁড়া টান করে অপেক্ষা করছিল।

নার্সের ব্যবস্থা কে করেছে, অশোক বুঝতে পারল না। জিজ্ঞেস করল, 'আপনি!'

নার্স অশোকের মনোভাব বুঝতে পেরেছিল। সে জানাল, চন্দ্রকান্ত রাহেজা তাকে নিয়ে এসেছেন। পুরো একটি সপ্তাহ চব্বিশ ঘণ্টা ধরে সে অশোককে নার্সিং করবে।

অশোক আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। কাপটা নিয়ে চুমুক দিল।

প্রায় দুশো গ্রাম খাঁটি দুধ আর চকোলেট রক্তের ভেতর অনেকটা এনার্জি ঢুকিয়ে দেয়। রীতিমত ঝরঝরে হয়ে ওঠে অশোকের নার্ভ।

নার্স কী বলতে যাচ্ছিল, সেই সময় মাথার কাছের ফোন বেজে ওঠে। সেটা তুলে নিয়ে হ্যালো বলতেই ওধার থেকে লীনার গলা ভেসে এলো, 'কেমন আছো অশোক?'

অশোক বলল, 'ভাল।'

'নার্সিং হোমে তোমার জন্যে কাল একটা মেসেজ রেখেছিলাম।'

'পেয়েছি। ধন্যবাদ।'

'আজ বিকেলে নার্সিং হোমে গিয়ে শুনলাম, তুমি চলে গেছ। তোমার বাড়িতে ফোন করেও পাওয়া গেল না। শুনলাম, অফিসে

কী জরুরী কাজ আছে। সেখানে গেছ।'

'হ্যাঁ।'

'এ রকম ইনজিওরড অবস্থায় এত স্ট্রেন করা তোমার উচিত হয়নি।'

'উপায় ছিল না লীনা। এনিওয়ে, আই অ্যাম অলরাইট নাউ।'

'তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে ওঠ।'

'উঠতেই হবে।'

লীনা বলল, 'শোন, তোমার সঙ্গে খুব জরুরী কিছু কথা আছে।'

অশোক বলল, 'বলে ফেল।'

'ফোনে বলা যাবে না।'

একা একা বাড়িতে শুয়ে থাকতে ভাল লাগছে না। এখন কেউ কাছে থাকলে গল্প করা যেত। ছেলেবেলা থেকেই টালিগঞ্জের ব্যারাকবাড়িতে পপুলেশন এক্সপ্লোসানের অ্যাটমসফীয়ারে সে বড় হয়ে উঠেছে। সেখানে চারপাশে শুধু ক্রাউড আর ক্রাউড। অজস্র মানুষ অবিরাম আওয়াজ, অন্তহীন হৈ-চৈ। সেই তুলনায় ওল্ড বালিগঞ্জের এই বাড়ি একেবারে নিঝুম। গণ্ডা গণ্ডা বেয়ারা বাবুর্চি মালী—সবই আছে এখানে। কিন্তু সবারই ঠোঁট স্টিকিং গাম দিয়ে যেন আটকানো। সাইলেণ্ট ফিল্মের অ্যাক্টরদের মতো তারা এই সুবিশাল ম্যানসনের বিরাট বিরাট কামরা, করিডর আর সিঁড়ি দিয়ে নিঃশব্দে যাতায়াত করে। এত নৈঃশব্দ্য অনেক সময় নার্ভের ওপর ভয়ানক চাপ দিতে থাকে।

অশোক বলল, 'আমার এখানে চলে এসো।'

'স্যরি। আজ যেতে পারছি না।' লীনা বলল, 'একটা ব্যাপারে খুব আটকে গেছি। আমার এক আমেরিকান ফ্রেণ্ড লস এঞ্জেলস থেকে এসেছে। তাকে ডিনারে ডেকেছি। আই উড বী বিজি দেয়ার।'

'তা হলে আর কী করা যাবে। পরেই তোমার কথা শুনব।'

'দু চারদিনের মধ্যেই তোমার ওখানে হানা দিচ্ছি।'

'ওয়েলকাম।'

লীনার সঙ্গে কথা বলে ক্রেডেলে ফোন না রাখতেই আবার বেজে উঠল।

এবার রেখা। অশোক এই মুহূর্তে তার ফোন আশা করেনি। সে বলল, 'আ রে তুমি!' তার গলা থেকে খুশি এবং বিস্ময় একই সঙ্গে উঠে এলো।

রেখা খুব ধীর এবং নিস্পৃহ ভঙ্গিতে বলল, 'মালতী কাকীমা তোমার খবর নিতে বলল। তাই রাস্তার ওষুধের দোকানে এসে ফোন করছি। কেমন আছ?'

'ভাল। মালতী কাকীমা না বললে বুঝি আমার খবর নিতে না?' সৌনিক বেপরোয়া অশোকের গলার স্বর ক্ষোভ বা অভিমানে সামান্য কাঁপে। সে বুঝতে পারে রেখার ব্যাপারে সে ক্রমশ সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়ছে।

রেখা বলল, 'তুমি তো অনেকটাই ভাল আছ। তা ছাড়া ফোনে তোমার মতো এত বড় একজন ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টকে যখন তখন পাওয়া কি সম্ভব?'

অশোক ব্যস্তভাবে বলল, 'সম্ভব নয় কেন? আমি অফিসের টেলিফোন অপারেটরদের বলে রেখেছি, তোমার ফোন পেলেই যেন আমাকে দেয়। আর বাড়ির লাইন তো ডাইরেক্টই। এখানে অপারেটরের ঝামেলা নেই।'

রেখা উত্তর দিল না।

অশোক আবার বলল, 'কী হল, চুপ করে রইলে কেন?'

রেখা আস্তে করে বলল, 'অকারণে বার বার তোমাকে ফোন করতে ভরসা হয় না।'

অশোক হঠাৎ খুবই অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। বলল, 'আমার সম্বন্ধে তোমার কমপ্লেক্সটা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। বলতে পারো, আমার অন্যায়টা কোথায়?'

উত্তর না দিয়ে রেখা বলল, 'আচ্ছা এখন ছাড়ি। পিছনে আরো অনেকে ফোন করার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। মালতী কাকীমাকে তোমার কথা জানিয়ে দেব।'

অশোক প্রায় চেঁচিয়েই উঠল, 'ছেড়ো না, ছেড়ো না, প্লীজ রেখা—'

কিন্তু তার আগেই লাইনটা কেটে গেল। হঠাৎ অদ্ভুত এক শূন্যতা চারদিক থেকে অশোককে যেন ঘিরে ধরতে থাকে। আস্তে আস্তে ফোনটা ক্রেডেলে নামিয়ে রাখে সে।

মিনিট তিনেকও কাটল না। তার আগেই সোমদেব চ্যাটার্জির ফোন এলো।

অশোকের মাথা এবং শরীরের অন্যান্য জায়গার চোটগুলো সম্পর্কে খোঁজখবর নেবার পর সোমদেব বললেন, 'শুনলাম আজ অফিসে গিয়ে হাই-পাওয়ার কমিটি আর ইউনিয়ন লীডারদের সঙ্গে তিন চার ঘণ্টা কনফারেন্স করেছ?'

অশোক জানে, সোমদেব তার প্রতিটি মুভমেন্টের ওপর সর্বক্ষণ নজর রাখছেন। পুরো একটা এসপিওনেজ টিম পিছনে লাগিয়ে দিয়েছেন কিনা, তাই বা কে বলবে। সে কোথায় যাচ্ছে, কী করছে, কী বলছে, কার সঙ্গে মিশছে, মুহূর্তে তিনি খবর পেয়ে যান। তাঁর মুখে কনফারেন্সের কথায় সে অবাক হল না। বলল, 'হ্যাঁ। ওঁদের সঙ্গে আলোচনায় না বসে উপায় ছিল না।'

'শুনলাম, খুব এফিসিয়েন্টলি তুমি সবগুলো ব্যাপার হ্যাণ্ডল করেছ। একেবারে ঝানু প্রফেসানালদের মতো।'

'এর মধ্যে প্রফেসানালিজম বা এফিসিয়েন্সির কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না। সমস্ত ব্যাপারটা র‍্যাশনাল অ্যাঙ্গল থেকে আমি বোঝাতে চেষ্টা করেছি।'

সোমদেব বললেন, 'র‍্যাশনালিটি খুব সহজ বস্তু না। ওটা ঠিক মতো থাকলে পৃথিবীতে অনেক সমস্যাই কমে যেত। একটু থেমে বললেন, 'হাই-পাওয়ার কমিটির মেম্বাররা আর ইউনিয়ন লীডাররা তোমার খুব প্রশংসা করছিলেন। দে স্পোক ভেরি হাই অফ ইউ। বিলিমোরিয়াদের মতো দুর্দান্ত সব টাইকুনের অ্যাপ্রিসিয়েসন পাওয়া খুব সোজা ব্যাপার না। যেভাবে কম্পিউটারের প্রবলেমটাকে হ্যাণ্ডল করেছ, তাতে শ্রমিক নেতাদের শ্রদ্ধা তোমার ওপর বেড়ে গেছে। আই

অ্যাম রীয়ালি হ্যাপি।'

শুনতে শুনতে ভুরু কুঁচকে যাচ্ছিল অশোকের। বিরক্তি, রাগ এবং উত্তেজনা তাকে যেন পেয়ে বসছিল। তার কারণও আছে। তাকে নিজের জায়গায় বসিয়ে হয়তো সারাক্ষণ উদ্বেগে কাটাচ্ছেন সোমদেব। সে যদি মারাত্মক কিছু করে বসে যাতে এই মনোপলি হাউসের ক্ষতি হয় বা আবহমান কাল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্ল্ডে যে সিস্টেম চালু আছে তার ওলটপালট ঘটে যায়, এই ভয়েই সোমদেব বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস থেকে শুরু করে ইউনিয়ন নেতা পর্যন্ত সবার সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন।

কিছুটা রুক্ষ গলায় অশোক বলল, 'বিলিমোরিয়া সাহেবদের আর ইউনিয়ন নেতাদের সঙ্গে আপনার তা হলে কথা হয়েছে?'

'নিশ্চয়ই।'

'আমাকে নিজের জায়গায় প্লেস করে আপনার বোধ হয় পার্মানেণ্ট ইনসমনিয়া হয়ে গেছে।'

'তার মানে?'

'মানেটা খুবই সহজ। ঝোঁকের মাথায় আমাকে এক্সপেরিমেণ্ট করতে দিয়ে এখন ভয় পেয়ে গেছেন। যদি আপনাদের হাউসের কোন বিপদ ঘটে যায় তাই আমাকে দিনরাত ওয়াচে রাখছেন। অনেকটা সেই রকম ব্যাপার আর কী?'

'কী রকম?'

'ঘুড়ি আকাশে উড়িয়ে দিয়ে লাটাই নিজের হাতে রেখে পুরোপুরি কনট্রোল করা। কিন্তু এতে আমি রাজী না। আই হেট ইট। ফ্রীলি চলতে না দিলে আমার এখানে থাকার মানে হয় না। এত কমপ্যাক্ট রুটিনে থেকে ক্যাপিটালিস্ট সিস্টেমকে সেবা করার মতো সারপ্লাস সময় আমার নেই। মিস্টার চ্যাটার্জি, আপনি যদি বলেন, আমি আজ এই মুহূর্তে সব ছেড়েছুড়ে টালিগঞ্জের ব্যারাকবাড়িতে ফিরে যাচ্ছি। আপনাদের ওয়েলথ্, অ্যাফ্লুয়েন্স বা আরাম সম্পর্কে আমার এক ফোঁটাও ইলিউসান নেই।'

সোমদেব বললেন, 'আই নো, আই নো। অশোক তুমি আমাকে মিসআণ্ডারস্ট্যাণ্ড করছ। আমি তোমার ওপর কোন রকম ওয়াচ রাখিনি। তোমাকে আমাদের ইণ্ডাস্ট্রিয়াল হাউসের মাথায় বসিয়ে আমার একটুও আপসোস হয়নি। এক সেকেণ্ডের জন্মেও রাতের ঘুম নষ্ট হয় নি। তবে—'

'তবে কী?' অশোক জানতে চাইল।

'তুমি কি ভাবে সোসাল প্যাটার্ণ চেঞ্জের জন্মে নতুন এক্সপেরিমেণ্ট করতে চাইছ, সে ব্যাপারে আমার ভীষণ কিউরিওসিটি। তাই একটু খোঁজখবর নিই আর কি। আই রীয়ালি ডোণ্ট হ্যাভ এনি আদার ইনটেনসন। তুমিই বল না, কৌতূহলটা কি অন্যায়?'

অশোক বিব্রতভাবে বলল, 'না, ঠিক তা নয়।'

সোমদেব বললেন, 'দেন ফরগেট ছাট চ্যাপ্টার। কম্পিউটারের প্রবলেমটা যে ভাবে হ্যাণ্ডল করেছ সে জন্মে আমার অভিনন্দন রইল।'

'ধন্যবাদ।'

একটু চুপ করে থেকে সোমদেব এবার বললেন, 'একজন ফর্মার ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হিসেবে না, বন্ধু এবং শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে তোমাকে একটা খবর দেবার আছে। এটা জানা থাকলে ভবিষ্যতে রাইট ডিরেকসনে চলতে পারবে।'

অশোক ভাবতে চেষ্টা করল, কোন ব্যাপারে সে কি কোন রকম ভুল করে বসেছে? চিন্তাগ্রস্তের মতো জিজ্ঞেস করল, 'কী খবর?'

'শুনলে তুমি কিন্তু শক্‌ড হবে।'

'আপনি বলুন না।'

সোমদেব শুরু করলেন, 'এই কম্পিউটার বসানোর ডিসিসানটা আমার আমলেই হাই-পাওয়ার কমিটি নিয়েছিল।'

অশোক বলল, 'এটা কোন শকিং ব্যাপারই না। আগেই এ খবর আমি জানি। এ-রকম একটা অ্যাণ্টি-লেবার পলিসি আপনি নেবেন, এটা আমার কাছে অদ্ভুত মনে হয়েছে।'

'অদ্ভুত কেন? আমি তো ট্রাডিশনাল ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট।

ক্যাপিটালিস্ট বলে যাদের তোমরা হেট কর আমি ঠিক তা-ই। এমন পলিসি তো আমার পক্ষেই নেওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এই পুরনো খবর দিয়েই তোমাকে আমি অ্যালার্ট করতে চাইনি।'

কিছু না বলে অশোক উদগ্রীব হয়ে রইল।

সোমদেব বলতে লাগলেন, 'কম্পিউটার আনার ব্যাপারে ডিসিসান নেওয়া হলেও আমরা জানতাম এগুলো বসানো যাবে না। অফিস আর ফ্যাক্টরি ওয়ার্কাররা প্রাণপণে বাধা দেবে। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল পীস টোটালি নষ্ট হয়ে যাবে। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, এগুলো শেষ পর্যন্ত বসাব না।'

অশোক বলল, 'তা সত্ত্বেও লুকিয়ে লুকিয়ে বসাবার ব্যবস্থা হচ্ছিল। দুটো দিক আমি কিছুতেই মেলাতে পারছি না।'

'এটা স্ট্রাটেজি। আর এই রণকৌশলের খবরটাই তোমাকে দিতে চাইছি অশোক।'

'কিসের রণকৌশল?'

'আমরা জানতে পেরেছি, ইউনিয়ন বিরাট এক চার্টার অফ ডিম্যাণ্ডস নিয়ে আন্দোলন শুরু করার প্ল্যান করছিল। কম্পিউটার দিয়ে সেটাকে অন্য দিকে ডাইভার্ট করতে চেয়েছিলাম। একটা বড় ধরনের আন্দোলন হয়ে যাবার পর তক্ষুণি আবার কেউ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় না। আমরা এর সুযোগ নিতে চেয়েছিলাম।'

'আপনারা অনেক দূর-ভবিষ্যতের স্ট্র্যাটেজি ঠিক করেন, তাই না?'

'রাইট। তা না হলে এত বড় ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এম্পায়ার চালানো সম্ভব হত না।'

একটু ভেবে অশোক বলল, 'তা হলে হাই-পাওয়ার কমিটির মেম্বাররা আমার সঙ্গে কনফারেন্স করলেন, এটা শো মাত্র? আগে থেকেই কম্পিউটারের ব্যাপারটা ঠিক করা ছিল?'

'কারেক্ট। তবে তোমার একটা কৃতিত্ব স্বীকার করতেই হবে। কম্পিউটার নিয়ে অনেক জল ঘোলা হত। এতে সহজে ওটা মিটত না। তোমার জন্যেই এত তাড়াতাড়ি পীসফুল আর ফ্রেণ্ডলি

অ্যাটমস্ফীয়ারে সমস্যাটার সমাধান হল।'

সোমদেবের কমপ্লিমেণ্ট পেয়েও অশোক উচ্ছ্বসিত হল না। নিজেকে ডিফিটিস্ট মনে হতে লাগল তার।

সোমদেব বললেন, 'এই খবরটা আশা করি তোমার কাছে নিশ্চয়ই খুব দামী মনে হবে। ক্যাপিটালিস্টরা কী ভাবে তাদের যুদ্ধের কৌশল ঠিক করে, সে সম্বন্ধে তোমার ধারণা থাকা একান্ত দরকার। এটা তোমার পক্ষে একটা মূল্যবান লেসন।'

অশোক বলল, 'আমার একটা কথা জানবার আছে।'

'অবশ্যই। কী জানতে চাও বল।'

'আমি সোসাইটির কোন ক্লাসকে রিপ্রেজেণ্ট করি, নিশ্চয়ই আপনি জানেন।'

'জানি বৈকি। হ্যাভ-নটদের ক্লাস।'

'আমার হাতে নিজেদের গোপন স্ট্র্যাটেজির প্ল্যানগুলো তুলে দিতে চাইছেন কেন? এগুলো আপনাদের বিরুদ্ধে তো মারণাস্ত্র হিসেবে আমি ব্যবহার করব। নিজের ক্লাসের সঙ্গে এ রকম বিশ্বাস-ঘাতকতা করছেন কেন? নাকি, এটাও অপনাদের অন্য কোন রকম মায়াত্মক চাল?'

'কীসের চাল?'

'যাতে আমার এক্সপেরিমেণ্ট সাকসেসফুল না হয়—'

সোমদেব শব্দ করে হাসলেন। বললেন, 'আমার মতো অন্য ক্লাসের লোককে তোমার সন্দেহ হতেই পারে। কিন্তু বিশ্বাস করতে পারো, এটা কোন রকম চাল নয়, নিজের ক্লাসের সঙ্গেও আমি বিট্রে করছি না।'

'তা হলে?' অশোক জিজ্ঞেস করল।

'তুমি ঠিক জানো না, কোন ভয়াবহ দুর্গে তুমি এসে ঢুকেছ। এখানকার যুদ্ধের পদ্ধতি তোমার আয়ত্তে নেই। একটা কথা নিশ্চয়ই তোমার জানা আছে। রামায়ণ মহাভারতে বীর যোদ্ধাদের তাদের স্ত্রী বা নিজের মেয়েরা নিজের হাতে সাজিয়ে দিতেন।'

'পড়েছি।'

'আমিও তেমনি তোমাকে রণসাজে সাজিয়ে দিতে চাই। অন্যায় যুদ্ধে তুমি হেরে যাও সেটা আমি চাই না।'

'আপনি বুঝি সারা জীবন ধর্মযুদ্ধের পক্ষপাতী?' আগুনের ফুলকির মতো অশোকের গলার ভেতর থেকে খানিকটা বিদ্রূপ বেরিয়ে এলো যেন।

সোমদেব বললেন, 'বলা মুশকিল। তবে তোমার সম্বন্ধে আমার কিছু দায়িত্ববোধ রয়েছে।'

'কীসের দায়িত্ববোধ?'

'আমাকে চ্যালেঞ্জ করেই তো তুমি এই ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এম্পায়ারে এসেছ। তোমার সাহস, ইন্টিগ্রিটি, সততা—এ সব সম্পর্কে আমার এতটুকু সন্দেহ নেই। কিন্তু অশোক, এগুলোই শেষ কথা নয়। যে কোন লড়াইতে নামতে হলে তার সঙ্গে দরকার অস্ত্র আর কৌশল। খালি হাতে কোন যুদ্ধই জেতা যায় না।'

অশোক উত্তর দিল না। সোমদেবের কথাগুলোর প্রতিটি অক্ষর তার কাছে প্রয়োজনীয় মনে হল।

সোমদেব আবার বললেন, 'আমরা ক্যাপিটালিস্টরা অনেক কাল ধরে দুর্গ সাজিয়ে বসে আছি। তার একটা ইঁট খসানোও সহজ ব্যাপার নয়। তোমার হাতে অস্ত্র তুলে দিতে চাইছি এই আশায় যাতে লড়াইটা একতরফা না হয়। এর পর দেখা যাক, কে হারে আর কে জেতে।'

অশোক বলল, 'মেনি থ্যাঙ্কস।'

একটু চুপ থেকে সোমদেব বললেন, 'যদি কিছু মনে না কর, একটা কথা বলি।'

'নিশ্চয়ই বলবেন। মনে কিছু করব না।'

'তিন মাস বারো দিন হল, তুমি আমাদের মনোপলি হাউসে এসেছ।'

'আপনি হিসেব রেখেছেন দেখছি।'

তা রেখেছি, মানে রাখতেই হয়েছে।' বলে হাসলেন সোমদেব।

তারপর শুরু করলেন, 'প্রায় সাড়ে তিন মাস সময়ের মধ্যে তুমি নিজের কাজ কিন্তু এখনও স্টার্টই করতে পারোনি।'

অশোক জিজ্ঞেস করল, 'নিজের কাজ বলতে?'

'তোমার এক্সপেরিমেন্ট।'

সোমদেবের কথার একটি শব্দও মিথ্যে নয়। অশোক বলল, 'খুব শিগগিরই আমার কাজ শুরু করে দেব।'

চোদ্দ

কম্পিউটারের সেই সমস্যা মিটে যাবার পর অফিস এবং ওয়ার্কশপ-গুলোতে আবার স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু হয়ে গেছে। মসৃণ নিয়মে সব কিছু চলছে, কোথাও বিন্দুমাত্র গোলমাল নেই।

সেদিন হাই-পাওয়ার কমিটির মেম্বার এবং ইউনিয়ন লীডারদের সঙ্গে কনফারেন্সের পর এক সপ্তাহ অফিসে যায়নি অশোক। আসলে বাড়ি থেকেই বেরোয় নি। কম্পিউটার বসানোর খবর পেয়ে উত্তেজনায় নার্সিং হোম থেকে চলে এসেছিল অশোক। তারপর তিন চার ঘণ্টা একটানা কনফারেন্স করেছে। সব মিলিয়ে নার্ভের ওপর প্রচণ্ড চাপ গেছে। প্রচুর রক্তপাতে শরীরও দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। সে বুঝতে পারছিল, ক'টা দিন রেস্টে না থাকলে সে মরেই যাবে।

অবশ্য সাতটা দিন শুয়ে শুয়েই কাটিয়ে দেয় নি অশোক। চন্দ্রকান্ত রাহেজাকে দিয়ে অজস্র বই, প্যামফ্লেট, সরকারী নানা রেকর্ড, ডকুমেন্ট, গভর্ণমেন্টের ফিসক্যাল পলিসির বিবরণ, ইকনমিস্ট এবং সোসিওলজিস্টদের রীসার্চ ওয়ার্কের কপি আনিয়ে সারাক্ষণ পড়েছে ও নোট নিয়েছে। সেই সঙ্গে প্রাইভেট এবং পাবলিক সেক্টরে এখন পর্যন্ত কত টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে, বছরে কত ছেলেমেয়ে কাজকর্ম পাচ্ছে, কত ছেলেমেয়ে ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট, ইউনিভারসিটি, মেডিকেল কলেজ ইত্যাদি জায়গাগুলো থেকে

ডিপ্লোমা, ডিগ্রি বা সার্টিফিকেট নিয়ে বেরিয়ে আসছে, দেশে বেকারের সংখ্যা কত, প্রতি বছর কাজের সুযোগ আর বেকারত্বের মাঝখানের গ্যাপ কতটা বাড়ছে—ইত্যাদি ইত্যাদি ব্যাপারগুলোও ভাল করে দেখে নিয়েছে। অবশ্য এম-এ পড়ার সময় এ সবই তাকে পড়তে হয়েছে কিন্তু এত খুঁটিয়ে এত ডিটেলে তখন পড়ে নি।

পড়া এবং নোট নেওয়ার ফাঁকে ফাঁকে সোমদেব, পারমিতা, লীনা প্রায় রোজই ফোন করে তার খবর নিয়েছে। রেখাও মালতী কাকীমার নাম করে ফোন করেছে। এ ছাড়া হেড অফিস থেকে নানা জরুরী ব্যাপারে তার মতামত জানার জন্য দিনে কম করে দশ পনেরোটা ফোন তো এসেছেই।

যাই হোক, অশোক জানে তাদের হাউসের ইনভেস্টমেণ্ট এবং অ্যাসেট মিলিয়ে হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। প্রাইভেট আর পাবলিক সেক্টর মিলিয়ে বছরে তিরিশ লাখ থেকে চল্লিশ লাখের মতো কাজের সুযোগ করতে পারে। কিন্তু এই বিশাল দেশে সত্তর থেকে আশী লাখ ছেলেমেয়ে কলেজ-ইউনিভারসিটিগুলো থেকে বেরুচ্ছে। তার মানে ফী বছর তিরিশ চল্লিশ লাখের একটা গ্যাপ থেকে যাচ্ছে। পুরনো বেকার এবং বছর বছর নতুন নতুন বেকারের সংখ্যা মিলে যে ছবিটা পাওয়া যাচ্ছে তা ভয়াবহ। বরফের বলের মতো অঙ্কটা ক্রমাগত বিপুল আকার নিচ্ছে। টোটাল এমপ্লয়মেণ্ট ছাড়া এই প্রবলেমের সলিউসান নেই। আর দ্রুত ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজেসন ছাড়া লক্ষ লক্ষ লোককে কাজ দেওয়াই বা যাবে কী করে?

অশোক হিসেব করে দেখেছে, তাদের হাউসে কম করে বছরে সাত থেকে দশ হাজারের মতো কাজের সুযোগ করা দরকার। তাতে পুরনো বেকারদের কিছু লোককে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দেওয়া যাবে এবং যারা কলেজ-টলেজ থেকে বেরুচ্ছে তাদের একটা অংশের জন্যও ব্যবস্থা হবে। এ জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা নেওয়া দরকার। এভাবে বিভিন্ন হাউস যদি পরিকল্পনা নেয়, প্রাইভেট সেক্টরে বছরে অতিরিক্ত পনেরো কুড়ি লাখ লোকের কর্ম-সংস্থান হওয়া সম্ভব। বাকীটা

পাবলিক সেক্টর ব্যবস্থা করবে।

সাত থেকে দশ হাজার লোকের কাজের সুযোগ করে দেওয়া সহজ ব্যাপার না। তা ছাড়া এক বছর করেই থামা চলবে না। বছরের পর বছর এটা চালিয়ে যেতে হবে। কাজেই সামনের দিকের আট দশ বছরের কথা ভেবে পুরো প্ল্যানিংটা করতে হবে। এ নিয়ে মোটামুটি ছকটা সে করে ফেলেছে। দু-একদিনের মধ্যে এর ফাইনাল চেহারা দাঁড় করিয়ে হাই-পাওয়ার কমিটির মিটিং ডাকবে। যে ভাবেই হোক, কাজের সুযোগ তাকে করতেই হবে।

আজ সকালে উঠে চা-টা খেয়ে ম্যাপ, চার্ট, নানা কাগজপত্র নিয়ে বসেছে অশোক। মাথা এবং শরীরের ব্যাণ্ডেজ এখন আর নেই। ঘা প্রায় শুকিয়ে এসেছে। নার্সকে এখনও বিদায় দেওয়া হয় নি। কাল-পরশুর মধ্যে সে চলে যাবে।

অশোক ঠিক করেছে, আরো চার-পাঁচ দিন অফিসে যাবে না। সেখানকার কাজকর্ম টেলিফোনেই সারবে। আসলে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার যে খসড়া সে করেছে সেটা নিখুঁত একটা আকার না দেওয়া পর্যন্ত অন্য কিছুই করতে ইচ্ছে করছে না। অশোকের মনটা দারুণ একমুখী। কোন একটা ব্যাপার নিয়ে পড়লে সেটা শেষ করতে না পারলে তার স্বস্তি নেই।

'অশোক—'

হঠাৎ দরজার কাছ থেকে কেউ ডাকল। চমকে মুখ তুলতেই অশোকের চোখে পড়ল লীনা দাঁড়িয়ে আসে। সে বলল, 'আরে তুমি! এ প্লেজাণ্ট সারপ্রাইজ!' বলে হাসল।

লীনা ভেতরে এসে অশোকের কাছাকাছি বসতে বসতে বলল, 'ক'টা দিন খুবই ব্যস্ত ছিলাম, তোমাকে দেখতে আসতে পারি নি। প্লীজ কিছু মনে করো না।'

'একেবারেই না। তুমি তো রোজই ফোন করে আমার খবর নিয়েছ। তারপর ব্যস্ততাটা কীসের? সেই আমেরিকান ফ্রেণ্ডকে

নিয়ে নিশ্চয়ই ?'

'রাইট। ইণ্ডিয়ান খাবার খাবে, টেগোরের গান শুনবে, ইণ্ডিয়ান থিয়েটার দেখবে, কথক নাচ দেখবে, ক্লাসিকাল মিউজিক শুনবে, সকাল থেকে মাঝরাত পর্যন্ত তাকে নিয়ে হোল ক্যালকাটা তোলাপাড় করতে হয়েছে।'

'বন্ধুটি এখন কোথায় ?'

'কাটমাণ্ডু। সেখান থেকে বেনারস হয়ে আবার ক্যালকাটা আসবে দু'সপ্তাহ বাদে। কাল রাতের ফ্লাইটে গেছে ডিক। তার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে আজ সকালেই তোমার কাছে চলে এলাম।'

'থ্যাঙ্কস।'

'আসলে আমেরিকায় থীসিস করার সময় ডিক আর তার ফ্যামিলি আমাকে প্রচুর সাহায্য করেছে। ওর কাছে নানা ভাবে আমি কৃতজ্ঞ। ও যখন এ দেশে এসে পড়ল, আই শুড রেসিপ্রোকেট সামওয়ে—'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।'

'তাই—' কিছু বলতে গিয়ে হঠাৎ লীনার চোখ এসে পড়ল অশোকের সেই সব চার্ট, রেকর্ড এবং নানারকম কাগজপত্রের ওপর। একটুক্ষণ অবাক হয়ে রইল সে। তারপর বলল, 'এ সব কী ?'

অশোক ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং কাজের সুযোগ তৈরি করার কথা বলল।

তক্ষুণি উত্তর দিল না লীনা। খানিকক্ষণ কী ভাবল সে, তারপর শুরু করল, 'একটা কথা বলব ?'

'অফ কোর্স।'

'আমাদের তো মিক্সড ইকনমির দেশ।'

'হ্যাঁ।'

'ওয়ার্ল্ডে অগুনতি কাণ্ট্রি আছে যারা মিক্সড ইকনমি নিয়ে এক্সপেরিমেণ্ট করছে।'

'জানি।'

'এদের ভেতর ইউরোপ আর আমেরিকার অনেকগুলো কান্ট্রি খুবই অ্যাডভান্সড। যেমন ধর, ইউ-কে ফ্রান্স ইতালি ওয়েস্ট জার্মানি—'

লীনার কথার মাঝখানেই অশোক বলে উঠল, 'ইউরোপ আমেরিকার এই কান্ট্রিগুলোর সঙ্গে এশিয়ার জাপানের নামটাও বল।'

'নিশ্চয়ই।' লীনা গলার স্বরে রীতিমত জোর দিয়ে বলে।

অশোক বলল, 'হঠাৎ তুমি মিক্সড ইকনমির দেশগুলোর নাম করছ কেন?'

'তুমি যে এক্সপেরিমেন্টের কথা ভাবছ, তার সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে। ওরা কী ভাবে মিক্সড ইকনমিকে কাজে লাগিয়েছে সেটা তোমার জানা দরকার।'

'বই পড়ে এ সম্বন্ধে আমার কিছু ধারণা আছে।'

লীনা বলল, 'আমি কী চাই জানো?'

অশোক বলল, 'কী?'

'বই পড়া সেকেণ্ড হ্যাণ্ড নলেজ না, এই সব দেশে গিয়ে নিজের চোখে সব দেখে এসো। তারপর সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগাও।'

অশোকের মনে হল, লীনার কথা ঠিক উড়িয়ে দেবার মতো নয়। বিভিন্ন দেশ মিশ্র অর্থনীতিকে কাজে লাগিয়ে কী ভাবে কতটা এগিয়েছে, কিংবা কতটা পিছিয়েছে সেটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভালভাবে জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। যে বিরাট কাজে নামার জন্য সে এই ইণ্ডাস্ট্রিয়াল হাউসে এসেছে তাতে শুধুমাত্র শ্লোগান দিয়ে মিরাক্‌ল্ ঘটানো যাবে না। হাজার সদিচ্ছাতেও কিছুই হবে না। এক্স-পেরিমেন্টে হাত দেবার আগে যেটা সব চাইতে বেশি প্রয়োজনীয় তা হল নিজেকে সব দিক থেকে তৈরি করে নেওয়া।

লীনা আবার বলল, 'তোমার উদ্দেশ্য আর ইচ্ছা—দুটোই গ্রেট। কিন্তু তুমি এখন যা করতে এসেছ সে ব্যাপারে এগুলো যথেষ্ট নয়। পরিষ্কার আইডিয়া আর অভিজ্ঞতা ছাড়া এক পা-ও তুমি এগুতে পারবে না।'

অশোক বলল, 'তুমি হয়তো ঠিকই বলছ।'

সামনের দিকে ঝুঁকে লীনা বলল, 'আমার একটা রিকোয়েস্ট আছে অশোক—'

'কী?'

'নেক্সট মান্থের শেষাশেষি আমি একবার স্টেটসে যাব। তুমি আমার সঙ্গে চল। আমাদের হাউস আমেরিকান আর ওয়েস্ট জার্মান কোলাবরেসনে এখানে কয়েকটা প্ল্যাণ্ট বসাচ্ছে। তুমি আমার সঙ্গে গেলে স্টেটস আর ইউরোপ ঘুরে আসব।'

অশোক ভাবল, নিজে সে যতই স্মার্ট হোক, নতুন অচেনা জায়গায় গিয়ে খাপ-খাওয়াতে যথেষ্ট সময় লাগবে। তারপর তো দেখাশোনা এবং বোঝার ব্যাপার। লীনা সঙ্গে থাকলে যে কোন জায়গায় যেতে, যে কোন মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সুবিধা হবে। সেটা সহজ কথা না। অশোক অবশ্য সব কিছু দেখবে নিজের মতো করে, নিজের চোখ দিয়ে। সামাজিক বা অর্থনীতিক দিকগুলো বিশ্লেষণ করবে নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে। সেই অভিজ্ঞতা তাকে শাণিত এবং ঝকঝকে করে তুলবে। একা একা গিয়ে দেখতে শুনতে বা যোগাযোগ করতেই যদি লম্বা সময় কেটে যায়, অভিজ্ঞতা হবে কখন? অশোক বলল, 'নট এ ব্যাড আইডিয়া কিন্তু—'

লীনা জিজ্ঞেস করল, 'কী?'

'বাইরে যেতে হলে পাশপোর্ট টাশপোর্ট তো করতে হবে।'

'তা তো করতেই হবে। না হলে যাবে কী করে?'

অশোক বলল, 'কত দিন লাগে পাশপোর্ট করতে?'

লীনা বলল, 'অর্ডিনারি লোকের ছ মাস, আট মাস কি তারও বেশি লাগতে পারে। তোমার মতো ভি-আই-পি'র ম্যাক্সিমাম দিন তিনেক। মিস্টার রাহেজাকে বল, উনিই সব ব্যবস্থা করে দেবেন।'

'দেখা যাক।'

একটু চুপ। তারপর লীনা শুরু করল, 'সত্যি সত্যি যদি তুমি যাও, ইউরোপ আমেরিকায় আর্থকোয়েক ঘটিয়ে দিতে পারবে।'

তার কথা ঠিক বুঝতে পারল না অশোক। বলল, 'আর্থকোয়েক বলতে?'

'মানে ভূমিকম্প। ওখানে গিয়ে আমি তোমার ইম্প্রেসারিও হয়ে যাব। প্রেস কনফারেন্স ডেকে বলব, ইণ্ডিয়াতে কী ধরনের এক্সপেরিমেণ্ট করতে যাচ্ছ তুমি। দেখবে রাতারাতি তোমার নাম নিউজ পেপারের হেডলাইনে উঠে যাবে।'

অশোক বলল, 'না-না, যদি সত্যি সত্যি যাওয়া হয় এ সব করতে যেও না। কোন রকম হৈ চৈ না করে চুপচাপ আমি সব দেখে আসতে চাই।'

আরও কিছুক্ষণ কথা-টথা বলে লীনা চলে গেল। যাবার আগে ইউরোপ আমেরিকাকে অশোকের মাথার ভেতর ভাল করে ঢুকিয়ে দিল।

পরের দিন সকালে ব্রেকফাস্টের পর অশোক রাহেজাকে বলল, 'মিস্টার সান্ধু, মিস্টার ভট্টাচারিয়া, মিস্টার বিলিমোরিয়া আর মিস্টার আগরওয়ালের বাড়িতে ফোন করুন।'

রাহেজা বুঝতে পারলেন, হাই-পাওয়ার কমিটির মেম্বারদের সঙ্গে অশোক কথা বলতে চায়।

রাহেজা একে একে সবাইকে ধরলেন।

অশোক তাঁদের বলল, 'আজ দুপুর দুটোয় আমার চেম্বরে অনুগ্রহ করে একটু আসবেন। খুবই জরুরী একটা কাজ আছে।'

জরুরী কাজটা কী, সে সম্পর্কে বিলিমোরিয়া থেকে সান্ধু পর্যন্ত সবাই জানতে চাইলেন।

অশোক জানাল, 'আমি আপনাদের কাছে একটা পরিকল্পনা পেশ করতে চাই।'

'কীসের পরিকল্পনা?'

'এখন বলব না। দুপুরে জানতে পারবেন।' বলে লাইনটা কেটে দিল অশোক।

দ্বিতীয় পর্ব সমাপ্ত